আ ক্রিসমাস ক্যারল

মূল: চার্লস ডিকেন্স
রূপান্তর: খসরু চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

প্রথম স্তবক

মার্লের ভূত

শুরুতেই বলছি, মার্লে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এ-ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাঁর বেরিয়াল-রেজিস্টারে দস্তখত করেছেন যাজক, কেরানি, আণ্ডারটেকার এবং চীফ মর্নার। এমনকি, স্ক্রুজও দস্তখত করেছেন। এরপরেও তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহের কোন উপায় আছে কী?

দরজায় ঠোকার পেরেকের মতই বুড়ো মার্লে এখন মৃত।

ভেবে দেখুন। মৃত্যুর সাথে পেরেকের কী সম্পর্ক? তাছাড়া, সম্পর্ক যে আছে, তা-ই বা আমি জানলাম কীভাবে? লোহা-ব্যবসার যাবতীয় সামগ্রীর মধ্যে পেরেককে আমার সবচেয়ে মৃত-মৃত মনে হয় বলেই কি ধারণাটা এসেছে আমার মাথায়? তবে, আমাদের পূর্বপুরুষের বুদ্ধি ছিল অনেকটা পেরেকের মতই। যাই হোক, আমার এই অপবিত্র হাতে আর তাঁদের বুদ্ধির ইতিহাস লিখতে চাই না। কারণ, লিখে তো আর তাঁদের বুদ্ধি বাড়ানো যাবে না, মাঝখান থেকে হয়ে যাবে দেশের সর্বনাশ। সুতরাং অনুমতি দিন, জোর দিয়ে আরেকবার বলি, দরজায় ঠোকার পেরেকের মতই বুড়ো মার্লে এখন মৃত।

কিন্তু মার্লে যে মৃত, স্ক্রুজ কি সে-কথা জানেন? নিশ্চয় জানেন। না জানার কোন উপায় নেই তাঁর। কারণ, অনেকদিন যাবৎ তিনি মার্লের ব্যবসার অংশীদার ছিলেন। কতদিন যাবৎ, সে আমি নিজেও জানি না। সত্যি বলতে কি, স্ক্রুজই মার্লের ব্যবসার একমাত্র অছি, একমাত্র প্রশাসক, একমাত্র কার্যনির্বাহী, দেনা-পাওনা মিটানোর পর বাদবাকি অংশের একমাত্র অংশীদার, একমাত্র বন্ধু এবং একমাত্র শোককারী। অবশ্য মার্লে যেদিন মারা যান, সেদিন তাঁকে খুব একটা শোকাহত মনে হয়নি। তবে তিনি যে একজন পাকা ব্যবসায়ী, মার্লের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার দিনটিতেও সে প্রমাণ দিতে তিনি ভোলেননি। আবেগের সুযোগ নিয়ে আণ্ডারটেকার যাতে ঠকাতে না পারে, সে-ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি ছিল বেশ প্রখর।

মার্লের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আলোচনা করতেই লেখার শুরুটা আবার মনে পড়ে গেল। মার্লে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, এ-ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আপনারা হয়তো ইতোমধ্যেই যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছেন এই ভেবে যে, আমি এই একটা বিষয় নিয়ে এত বকবক করছি কেন। যা-ই ভাবুন না কেন, বিষয়টার

গুরুত্ব কিন্তু কম নয়। নাটক শুরুর আগেই যদি পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া না যায় যে, হ্যামলেটের বাবা মারা গেছেন, তাহলে হ্যামলেটের মত মহৎ নাটকও অনেকখানি খেলো হয়ে যায়। গভীর রাতে যখন ধীরে ধীরে বইতে থাকে পুবাল বাতাস, ঠিক তখনই এসে হাজির হন হ্যামলেটের বাবা। এই দৃশ্যই হ্যামলেটের দুর্বল মনে সাহস জোগায়। অথচ দর্শক যদি এটাই বুঝতে না পারেন যে, হ্যামলেটের বাবা মারা গেছেন, তাহলে অন্ধকার নামার পর কোন মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের হাওয়া খাওয়ার সাথে দুর্গপ্রাকারের ওপর দিয়ে হ্যামলেটের বাবার প্রেতাত্মার পায়চারি করার আর কোন পার্থক্য থাকে না।

মার্লে মারা গেলেও স্ক্রুজ অবশ্য তাঁর নামের সাথে সম্পর্ক ঘুচিয়ে ফেলেননি। বছরের পর বছর, এমনকি আজও, দোকানের বাইরে সাইনবোর্ডে লেখা আছে, স্ক্রুজ অ্যাণ্ড মার্লে। যাঁরা লোহার কারবারে নতুন, তাঁদের কেউ কেউ স্ক্রুজকে স্ক্রুজ নামে ডাকেন, আবার কেউ কেউ ডাকেন মার্লে। স্ক্রুজ দুই নামেই সাড়া দেন অবলীলায়। তাঁর কখনও মনে হয়নি, মানুষের নাম আবার গুরুত্ব দেয়ার মত কোন জিনিস।

কিন্তু বুড়ো খুব শক্ত মনের মানুষ, ঠিক যেন চকমকি, ইস্পাতও যা থেকে সহজে আগুন বের করতে পারে না। সবকিছু গোপন রাখতে ভালবাসেন তিনি। আর নিজেকে নিয়েই পরিতৃপ্ত–যেন বিশাল এই পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ না থাকলেও তাঁর এমন কিছু অসুবিধে হত না। সারাজীবন ঝিনুকের মত নিঃসঙ্গ থাকায় তাঁর ভেতরে জন্ম নিয়েছে এক ধরনের শীতল ভাব, যে-শীতলতা অত্যন্ত বুড়িয়ে দিয়েছে তাঁকে, কুঁচকে দিয়েছে চিবুকের চামড়া, হাঁটার ভঙ্গিতে এনে দিয়েছে আড়ষ্টতা, চোখদুটোকে করেছে লাল, ঠোঁটকে করেছে নীল আর জিহ্বাকে করেছে চতুর। তাঁর মাথা আর ভ্রূ তুষারের মত সাদা। বছরের উষ্ণতম সময়ে দোকান ঠাণ্ডা রাখার জন্যে বরফ এনে রাখেন তিনি, ক্রিসমাসেও সেগুলো সরানোর প্রয়োজন অনুভব করেন না।

আসলে বাইরের গরম কিংবা ঠাণ্ডা তাঁর ওপর খুব একটা কাজ করে না। গ্রীষ্ম তাঁকে অতিষ্ঠ করতে পারে না, ঠাণ্ডা লাগাতে ব্যর্থ হয় শীতকাল। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া কখনোই বাগে পায় না তাঁকে। আর পাবেই বা কী করে? ভয়ঙ্কর কনকনে যে-বাতাস বইয়ে দেয় প্রকৃতি, স্ক্রুজ নিজেই তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। দরজা-জানালা খোলা থাকলে মানুষের বাড়িতে প্রবেশ করার অধিকার পেয়ে যায় বৃষ্টি, কিন্তু তাঁর অন্তরে প্রবেশের অধিকার আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি।

মাঝেমধ্যে রাস্তায় বেড়াতে বের হন স্ক্রুজ। কিন্তু কখনোই কেউ বলে ওঠে না, 'আরে, স্ক্রুজ যে! কেমন আছেন? আমাদের এদিকে আসা যে ভুলেই গেছেন। তা কবে আসছেন, বলুন!' একটা পয়সা পাবার আশায় তাঁর পিছু নেয় না কোন ভিক্ষুক, কোন বাচ্চা জানতে চায় না–ক'টা বাজে। জীবনে কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেনি, অমুক রাস্তা কিংবা জায়গাটা কোথায়। শুধু তা-ই নয়, যেসব অন্ধ ভদ্রলোক কুকুর সাথে নিয়ে বেড়াতে বের হন, তাঁদের কুকুরেরা পর্যন্ত স্ক্রুজকে চেনে। বাড়ি থেকে বেরোনোর মুখে স্ক্রুজকে দেখলে মালিকের কাপড় টেনে ধরে

তারা, স্ক্রুজ দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত বেরোতে দেয় না। আর লেজ নাড়ে ঘনঘন, যেন বলতে চায়, 'অশুভ চোখ থাকার চেয়ে চোখ একেবারে না থাকাও অনেক ভাল, প্রভু!'

কিন্তু স্ক্রুজ কি এসবের পরোয়া করে? মোটেই না। বরং এসব তিনি পছন্দ করেন। মনেপ্রাণে চান, কোন লোক তাঁর কাছ না ঘেঁষুক, মানবিক যাবতীয় অনুভূতি পালিয়ে যাক ভয়ে। দয়ামায়া প্রভৃতি সুকুমার গুণাবলী স্ক্রুজের কাছে পাগলামির নামান্তর।

অনেক বকবক করলাম, আর নয়, গল্প শুরু করি এবার।

ক্রিসমাসের আগের দিন। কাউন্টিং-হাউসে লেনদেনের হিসেব নিয়ে ব্যস্ত আছেন স্ক্রুজ। আবহাওয়া খুব একটা সুবিধের নয়। কুয়াশায় চারপাশ ঢেকে গিয়েছে, সেই সাথে বইছে কনকনে বাতাস। বাইরে পথচারীদের আনাগোনা টের পাচ্ছেন স্ক্রুজ। ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস নিতে নিতে পথ চলছে তারা, আর মাঝে মাঝেই বুকের ওপর থাবড়াচ্ছে, নয়ত ফুটপাথে পা ঠুকছে একটু উষ্ণতা পাবার আশায়। কিছুক্ষণ আগেই ঢংঢং করে বেজে উঠেছে শহরের বড় ঘড়িটা। সবে তিনটে বাজে, অথচ ইতোমধ্যেই আঁধার নেমেছে চারপাশে। অবশ্য সকাল থেকেই আলো ছিল বেশ কম, আশেপাশের অফিসগুলোর জানালায় জানালায় কাঁপছে মোমবাতির শিখা। কুয়াশা এতই ঘন যে, সামান্য ফাটল, এমনকি চাবির ফুটো দিয়ে পর্যন্ত ঢুকে পড়ছে ঘরে। নিষ্প্রভ মেঘ ঝুঁকে পড়ে যেন মিলিত হয়েছে কুয়াশার সাথে। রাস্তার ওপারের বাড়িগুলোই ঝাপসা দেখাচ্ছে, দূরেরগুলো সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

কিন্তু এরকম আবহাওয়াতেও স্ক্রুজের কাউন্টিং-হাউসের দরজাটা খোলা। কারণ, দরজার ওপারেই রয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছোট্ট একটা ঘর, যেখানে বসে চিঠি নকল করছে তাঁর কেরানি। সে যাতে কাজে ফাঁকি দিতে না পারে, সেজন্যেই দরজা খোলা রেখেছেন স্ক্রুজ। ধিক ধিক করে জ্বলা আগুন ঈষৎ গরম করে রেখেছে কাউন্টিং-হাউসের ভেতরটা। কিন্তু কেরানির ঘরের আগুনটা এতই ছোট যে, মনে হয় যেন একমাত্র কয়লা জ্বলছে। আগুনটা একটু উসকে দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল কেরানি, কিন্তু লাভ হয়নি। কারণ, কয়লার বাক্সটা রয়েছে কাউন্টিং-হাউসে। একটা বেলচা হাতে সেখানে ঢুকতেই স্ক্রুজ খেঁকিয়ে উঠেছিলেন এই বলে যে, তিনি বুঝে উঠতে পারেন না, মানুষের এত শীত লাগে কোত্থেকে, বরং সত্যিই যদি বেশি শীত পড়ে তাহলে ওই কয়লাটুকু কাজে লাগবে। ফলে, নিজের ঘরে ফিরে এসেছে বেচারি, উষ্ণতার আশায় নিজেকে সঁপে দিয়েছে সাদা একটা মাফলার আর মোমবাতির হাতে। কিন্তু আর দশটা কেরানির মতই যেহেতু কল্পনাশক্তির এমন কিছু দৌড় তার নেই, শীত খুব একটা কাটছিল না এতে।

'ক্রিসমাস আনন্দময় হোক, মামা! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!' ভেসে এল উৎফুল্ল একটা কণ্ঠ। পরক্ষণেই একরকম ছুটে এসে ঘরে ঢুকল স্ক্রুজের ভাগনে।

'বাহ্!' বললেন স্ক্রু, 'উজবুকের খুশি দেখো!'

ঠাণ্ডা এড়ানোব জন্যে এত জোরে হেঁটে এসেছে সে যে প্রায় ঘর্মাক্ত হয়ে

উঠেছে শরীর। সুন্দর মুখটা লাল টকটকে হয়ে গেছে, নিঃশ্বাসের সাথে সাথে বেরিয়ে আসছে ভাপ।

'এই ক্রিসমাসের সময়ও আমাকে উজবুক বলছেন, মামা! নিশ্চয় মন থেকে বলেননি কথাটা?'

'মন থেকেই বলেছি,' খেঁকিয়ে উঠলেন স্ক্রুজ। 'ক্রিসমাস আনন্দময় হোক! বলি, আনন্দিত হবার কী অধিকার আছে তোমাদের? কী কারণ আছে? তোমরা বেশ গরীব।'

'তাহলে আপনার কথা অনুসারেই বলি,' প্রফুল্ল স্বরে বলল ভাগনে। 'আপনারই বা মুখ গোমড়া করে থাকার কী অধিকার আছে? কী কারণ আছে মেজাজ খিটখিটে হওয়ার? আপনি বেশ ধনী।'

একটু থতমত খেয়ে গেলেন স্ক্রুজ। তাৎক্ষণিক কোন উপযুক্ত জবাব খুঁজে না পেয়ে বললেন, 'বাহ্!' সামান্য ইতস্তত করে আবার বললেন, 'উজবুকের খুশি দেখো!'

'অযথা মেজাজ খারাপ করবেন না, মামা!' বলল ভাগনে।

'মেজাজ ঠিকই বা রাখি কীভাবে,' বললেন স্ক্রুজ, 'যেদিকেই তাকাই, শুধু উজবুকের দল! ক্রিসমাস আনন্দময় হোক! যাও, আনন্দ করোগে! আরে বাবা, ক্রিসমাসে আনন্দ করার কী আছে? বিশেষ করে তোমাদের মত লোকের ক্রিসমাস বলতে তো ধারে একগাদা জিনিস কেনা, সেইসাথে একটা বছর বয়স বাড়ানো। দুটো টাকা জমবে কি করে, সেদিকে নজর নেই কারও। বলি, এই সময়টাতে অযথা লাফালাফি না করে বসে বসে সারা বছরের জমা-খরচের হিসেবটাতে একবার চোখ বুলালেও তো অনেক লাভ হয়। যদি পারতাম,' কণ্ঠে ঘৃণা ভর করল স্ক্রুজের, 'এই "ক্রিসমাস আনন্দময় হোক" বলে নাচানাচি করার দলটার সব ক'টাকে সেদ্ধ করতাম তাদেরই চুলোয়, তারপর পবিত্র একটা কীলক ঢুকিয়ে দিতাম হৃৎপিণ্ডে। হ্যাঁ, ওদের তাই-ই করা উচিত।'

'মামা! শুনুন,' ওকালতির সুরে বলল ভাগনে।

'খামকা তর্ক কোরো না,' কড়া গলায় বললেন স্ক্রুজ, 'তোমাদের ইচ্ছেমত ক্রিসমাস পালন করো তোমরা, আমি করব আমার ইচ্ছেমত।'

'তা-ই করুন,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিল ভাগনে। 'কিন্তু আপনি তো ক্রিসমাস পালন করেন না!'

'পালন করব কি করব না, সে ব্যাপারটা বরং আমার ওপরেই ছেড়ে দাও,' বললেন স্ক্রুজ। 'পালন করে উন্নতি হোক তোমাদের! যেন কত উন্নতিই করেছ ক্রিসমাস পালন করে!'

'মামা, আপনি হয়তো রাগ করবেন, তবু কিছু কথা না বলে পারছি না,' নড়েচড়ে বসল ভাগনে। 'পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে, যেগুলোতে লাভ খুঁজে পাওয়া না গেলেও আনন্দ পাওয়া যায়। ক্রিসমাস তাদের অন্যতম। এই দিনটিতে দয়া, ক্ষমা, দানশীলতা এবং আনন্দের মধুর স্পর্শে যেন নতুন করে সতেজ হয়ে ওঠে আমাদের জীবন। পার্থিব যাবতীয় নীচতা-ক্ষুদ্রতা ভুলে মানুষ মন খুলে মেশে আরেকজনের সাথে। নিজের নিজের সামাজিক অবস্থান ভুলে নজর

দেয় গরীবদের দিকে। অনুভব করে, একদিন সবাইকে যেতে হবে কবরে–যেখানে ধনী-দরিদ্র-উঁচু-নিচু কোন ভেদাভেদ নেই। এই দিনটিই আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, বিবেকহীন জন্তুর মত বিচরণ আমাদের সাজে না। আমরা সৃষ্টির সেরা, নির্দিষ্ট একটা গন্তব্য আছে আমাদের। সুতরাং এই দিনটিতে আমার পকেট সোনা বা রুপোয় ভরে না উঠলেও হৃদয় ভরে ওঠে আনন্দে। এতদিন ক্রিসমাস পালন করে কোন উন্নতি না হলেও কোন ক্ষতিও হয়নি আমার। বরং সর্বদিক বিচার করলে বলতে হয়, দিনটি আমার উপকারই করেছে, ভবিষ্যতেও করবে। আর তাই "ক্রিসমাস আনন্দময় হোক" না বলে পারি না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত তিনি যেন দিনটিকে আনন্দময়ই রাখেন।'

পাশের ঘরে নিজের অজান্তেই হাততালি দিয়ে উঠল কেরানি। পরক্ষণেই মহাভুলটা বুঝতে পেরে হন্তদন্ত হয়ে আগুন উসকে দিতে গিয়ে একমাত্র জ্বলন্ত কয়লাটাকেও দিল নিবিয়ে।

'আরেকবার হাততালি দাও,' খেঁকিয়ে উঠলেন স্ক্রুজ, 'বিদায় করে দিই তোমাকে। অবশ্য চাকরি হারালে সুবিধেই হবে তোমার, অফুরন্ত সময় ধরে মহা আনন্দে পালন করতে পারবে আনন্দময় ক্রিসমাস।' একটু থেমে ভাগনের দিকে ফিরে বললেন, 'সত্যি, স্যার, বক্তা হিসেবে যে আপনি অত্যন্ত শক্তিশালী, সে-কথা অস্বীকার করার উপায় দেখছি না। ভেবে অবাক হচ্ছি, এতদিন আজেবাজে জায়গায় পড়ে না থেকে পার্লামেন্টে যোগ দেননি কেন!'

'রাগ করবেন না, মামা। তার চেয়ে বরং এসব তর্কাতর্কি বাদ দেয়া যাক। আগামীকাল আসুন আমাদের বাড়িতে। কাল আমরা সবাই একসাথে খাব।'

চিবিয়ে চিবিয়ে স্ক্রুজ বললেন যে, তিনি যাবেন–অবশ্যই যাবেন। না গিয়ে কি তিনি পারেন? ক্রিসমাসের খাওয়া বলে কথা! প্রয়োজন হলে হিসেবের খাতাপত্র ছিঁড়ে রেখে যাবেন।

'কী ব্যাপার, মামা?' চেঁচিয়ে উঠল ভাগনে। 'আপনি আমার সাথে এরকম দুর্ব্যবহার করছেন কেন?'

'তার আগে বলো, তুমি বিয়ে করেছ কেন?'

'একটা মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছিলাম–তাই।'

'কাজের কাজ করেছিলে!' এমন ভাবে ধমকে উঠলেন স্ক্রুজ, যেন পৃথিবীর যাবতীয় কিছুর মধ্যে ক্রিসমাসের চেয়ে হাস্যকর ব্যাপার আর একটাই আছে–ভালবাসা। 'গুড আফটারনুন!'

'আপনার যুক্তিটা কিন্তু ঠিক হলো না, মামা। বিয়ের আগেও তো আপনি কখনোই আমাদের বাড়িতে যাননি। তাহলে এখনই বা অযথা একটা যুক্তি খাড়া করে যেতে চাইছেন না কেন?'

'গুড আফটারনুন,' বললেন স্ক্রুজ।

'কখনও আমি আপনার কাছে কিছু চাইনি; চাইতে আসিনি আজও: সুতরাং আমাদের তো বন্ধু হতে কোন বাধা নেই!'

'গুড আফটারনুন,' বললেন স্ক্রুজ।

'জানি না, কেন আপনি এই একগুঁয়েমি করছেন। কোন ক্ষতি তো দূরের

কথা, আপনার সাথে কখনও ঝগড়া করেছি বলেও তো মনে পড়ে না। যা-ই হোক, মানুষ ভেদে মতেরও ভেদ হয়। আপনি আজ অনেক কিছুই বললেন। কিন্তু আমি ঠিক করেছি, অযথা রাগারাগি করে আগামীকালের পবিত্র দিনটিকে আর কলুষিত করে তুলব না। সুতরাং যাবার আগে আবারও বলছি, ক্রিসমাস আনন্দময় হোক, মামা।'

'গুড আফটারনুন!' চেঁচিয়ে উঠলেন স্ক্রুজ।

'এবং হ্যাপি নিউ ইয়ার!'

'গুড আফটারনুন!' রাগে কাঁপতে লাগলেন স্ক্রুজ।

উঠে দাঁড়াল ভাগনে, কোনরকম রাগারাগি না করে বেরিয়ে এল বাইরে। দরজার এপারে একটু দাঁড়িয়ে কেরানিকে ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা জানাল সে। দীর্ঘদিন ধরে স্ক্রুজের এখানে চাকরি করতে করতে অনেকটা শীতল হয়ে এলেও কেরানির মনটা একেবারে মরে যায়নি। শুভেচ্ছা জানাল সে-ও।

'ওই যে আরেকজন,' কথাগুলো শুনতে পেয়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন স্ক্রুজ, 'আমার কেরানি, সপ্তাহে পনেরো শিলিং পায়, আস্ত একটা পরিবার ঘাড়ের ওপর, অথচ আনন্দময় ক্রিসমাসের আলোচনায় মশগুল! ক্রিসমাস নিয়ে এই পাগলামি দেখতে দেখতে নিজেই পাগল হয়ে যাব মনে হচ্ছে। তারচেয়ে বরং বাড়ি ফিরে যাই।'

স্ক্রুজের ভাগনে চলে যেতে না যেতেই দু'জন ভদ্রলোক ঢুকলেন ঘরের ভেতরে। পরনে ধোপদুরস্ত পোশাক, মোটামুটি গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারা, হাতে বই ও কিছু কাগজপত্র। ঘরের চারপাশে নজর বুলিয়ে, হ্যাট খুলে, স্ক্রুজকে অভিবাদন জানালেন তাঁরা।

তারপর হাতের তালিকাটা কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে একজন বললেন, 'এটা নিশ্চয় স্ক্রুজ অ্যাণ্ড মার্লে? তো, দয়া করে যদি একটু বলতেন, আপনি মি. স্ক্রুজ নাকি মি. মার্লে?'

'মি. মার্লে সাত বছর আগে মারা গেছেন,' জবাব দিলেন স্ক্রুজ। 'হ্যাঁ, ঠিক সাত বছর আগে, আজকের রাতে।'

'আমরা আশা করি, তিনি যেরকম উদার মনের মানুষ ছিলেন, তাঁর পার্টনারও ঠিক সেই রকমই হবেন,' বলে একটু এগিয়ে এসে স্ক্রুজের হাতে নিজের পরিচয়পত্র ধরিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

অবশ্য কথাটা ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন। আগে স্ক্রুজ কখনোই মার্লের কথার ওপর কথা বলতেন না। ফলে, বাইরের মানুষের কাছে তাঁর আসল পরিচয়ের বদলে উদারতাই ফুটে উঠত। কিন্তু এখন 'উদারতা' শব্দটির উল্লেখে ভ্রূকুটি করলেন স্ক্রুজ, একবার চোখ বুলিয়েই ফিরিয়ে দিলেন পরিচয়পত্রটা।

'তো, বছরের এই বিশেষ পর্বটিতে,' পকেট থেকে একটা কলম তুলে নিয়ে বললেন ভদ্রলোক, 'আমাদের সবার উচিত, গরীব ও নিঃস্বদের জন্যে যথাসাধ্য অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা। এরা সারাটা বছর, বিশেষ করে এই শীতের সময় অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করে। হাজার হাজার মানুষের ভাগ্যে এক টুকরো রুটি আর পরনের কাপড়টুকুও জুটছে না। অতি সাধারণ আরামগুলোর অভাবে ভুগছে লক্ষ

লক্ষ মানুষ।'

'দেশের জেলখানাগুলো কি সব উঠে গেছে?' জানতে চাইলেন স্ক্রুজ।

'না, না, উঠে যাবে কেন, সবই আগের মতই আছে,' কলমটা আবার পকেটে রেখে তড়িঘড়ি জানালেন ভদ্রলোক।

'আর ইউনিয়ন ওয়র্কহাউসগুলো?' আবার জানতে চাইলেন স্ক্রুজ। 'ওগুলো কি সচল আছে এখনও?'

'হ্যাঁ, আছে। এখনও সচলই আছে,' বললেন ভদ্রলোক, 'অবশ্য "নেই" বলতে পারলেই আমি খুশি হতাম।'

'তাহলে ট্রেডমিল আর পুওর ল পুরোপুরি কার্যকরই রয়েছে, তাই না?' সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন স্ক্রুজ।

'জ্বী, স্যার।'

'আহ্!' আয়েশ করে আবার হেলান দিলেন স্ক্রুজ। 'আপনার কথা শুনে তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম যে, ওগুলো বোধহয় অচল হয়ে পড়েছে। হয়নি জেনে খুব সুখী হলাম।'

'কিন্তু ওগুলোর কোনটাই গরীব কিংবা নিঃস্বদের চাহিদা মেটাতে পারছে না বললেই চলে,' বললেন ভদ্রলোক, 'তাই ভাবলাম, এসব কাজে আমাদের মত মানুষের এগিয়ে আসা উচিত। এখন থেকে একটা তহবিল সংগ্রহ করব আমরা, যা থেকে মাংস, পানীয় ও গরম কাপড় কিনে বিলি করা হবে ওদের মাঝে। আর কাজটার জন্যে এই সময়টাই বেছে নেয়ার কারণ হলো, বছরের এই সময়টাতে পারস্পরিক একটা ভ্রাতৃত্ব এবং মমত্ববোধ জেগে ওঠে সবার মধ্যে, চারপাশের প্রাচুর্য দেখে আমরা অনুভব করি নিঃস্ব মানুষদের বেদনা। তা, আপনার নামে কত লিখব?'

'কিছুই না!' জবাব দিলেন স্ক্রুজ।

'আড়ালে থাকতে চান?'

'একেবারে আড়ালে। আমি চাই না, এসব ব্যাপারে আমাকে কেউ জ্বালাতন করুক। আপনাদের মতে ক্রিসমাস "আনন্দময়" হলেও আমি এই দিনটিতে আনন্দ করি না, কাউকে আনন্দিত করতেও চাই না। অলস লোকদের আনন্দের পেছনে ঢালার মত বাজে টাকা আমার নেই। যে-প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা বললাম, আমি ওগুলোকে সমর্থন করি–ওরাও যথেষ্ট খরচ করে। তারপরেও যদি দেশে গরীব কিংবা নিঃস্ব লোক থাকে, তাদের উচিত এখনই প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ করা।'

'কিন্তু অনেকের পক্ষেই যোগাযোগ করা সম্ভব নয়; তাড়াতাড়ি সাহায্য না পেলে তাদের কেউ কেউ মারাও যেতে পারে।'

'যদি সত্যিই মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে,' বললেন স্ক্রুজ, 'তাহলে তাদের মারা যাওয়াই উচিত, মরে অধিক জনসংখ্যা রোধে ভূমিকা রাখা উচিত। তাছাড়া–মাফ করবেন–এসব নতুন নতুন ব্যাপারে মাথা ঘামানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কিন্তু মাথা ঘামানোটা উচিত ছিল,' বললেন ভদ্রলোক।

'মোটেই না,' ত্বরিত জবাব দিলেন স্ক্রুজ। 'আমার ব্যবসার সাথে আপনাদের এই ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া, একটা ব্যবসা ভালভাবে বুঝতেই জীবন কেটে যায়, সুতরাং একজন ব্যবসায়ীর উচিত নয় আরেকজনের ব্যবসায়ে নাক গলানো। আর, অত সময়ই বা কোথায়? নিজের ব্যবসার দিকে নজর রাখতেই ঘাম ছুটে যায়! যাই হোক, আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুব ভাল লাগল, গুড আফটারনুন!'

এখানে কথা বলে যে কোন লাভ হবে না, সেটা পরিষ্কার বুঝতে পেরে বিদায় নিলেন ভদ্রলোক দু'জন। নতুন উদ্যমে আবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্ক্রুজ। তিনি রসিকতা করতে পারেন, এটা তাঁর জানা ছিল। কিন্তু কাজটা যে এত ভাল প্যারেন, তা জানা ছিল না। ভারী প্রসন্ন বোধ করছেন তিনি, ভারী তৃপ্ত।

ইতোমধ্যে চারপাশ আরও ঢেকে গিয়েছে কুয়াশায়, আরও ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকার। না হেঁটে একরকম দৌড়েই চলেছে এখন পথচারীরা, ঘোড়ার গাড়িও পেরে উঠছে না অনেকের সাথে। কিন্তু যথাসময়ে বেজে উঠছে বড় ঘড়িটা, সবার ছুটি মিললেও তার আর ছুটি মিলবে না। ভারী কুয়াশার কারণে দেখা যাচ্ছে না ঘড়িটা। ফলে, ওটা বেজে উঠতে মনে হচ্ছে, যেন মেঘের মধ্যে বসে ঘণ্টা বাজাচ্ছে কেউ। ঘণ্টা শেষ হবার পর অনেকক্ষণ ধরে কাঁপছে শব্দটা, যেন প্রচণ্ড শীতে দাঁত ঠকঠক করছে ঘড়িটার। শীত অবশ্য সত্যিই পড়েছে। সদর রাস্তার এক কোণে গ্যাস-পাইপ মেরামত করছে কয়েকজন শ্রমিক। বড় একটা পাত্রে আগুন জ্বেলেছে তারা। গনগনে সেই আগুনের চারধারে দাঁড়িয়ে হাত-পা সেঁকছে আর আরামে চোখ মিটমিট করছে মলিন পোশাক পরা কয়েকজন মানুষ। রাস্তার আরেক পাশে পানির কলটা যে খোলা আছে, সেটা লক্ষ করছে না কেউ। ফলে ক্রমাগত উপচে পড়ছে পানি, আর প্রায় সাথে-সাথেই জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। দোকানের উজ্জ্বল আলোয় ক্ষণিকের জন্যে পথচারীদের ফ্যাকাসে মুখ লাল হয়ে উঠছে। মুরগির মাংস আর মুদির দোকানে হামলে পড়েছে মানুষ। একজন করে ঢুকছে আর বেরিয়ে আসছে ব্যাগভর্তি জিনিস নিয়ে। হাবভাবে মনে হচ্ছে, কেউ যেন জিনিস কেনার সময় দর-কষাকষি করেনি। ওদিকে প্রাসাদের ভেতরে পঞ্চাশজন পাচক আর বাটলারকে যথাবিহিত নির্দেশ দিচ্ছেন মেয়র। আগামীকালের ব্যাপারটা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন তিনি। কারণ, মেয়রের বাড়ির ক্রিসমাস মেয়রের উপযুক্ত না হলে মাথা কাটা যাবে তাঁর। অবশ্য অনেক শক্ত শক্ত ব্যাপার মোকাবেলা করার অভ্যেস আছে তাঁর, শুধু নিজের বাড়ির ক্রিসমাস হলে মাথাই ঘামাতেন না। কিন্তু তা তো নয়, কর্মচারীদের বিষয়েও ভাবতে হয় তাঁকে মেয়রের কর্মচারীদের ক্রিসমাস দেখেও মানুষকে টের পেতে হবে যে, এরা মেয়রের কর্মচারী। অবশ্য কর্মচারীরাও মালিকের মনোভাব সম্বন্ধে পুরোপুরিই ওয়াকিফহাল। ফলে, মাত্র গত সোমবারেই মাতাল হয়ে রাস্তায় মারপিট করার জন্যে জরিমানা দিতে হয়েছে যে দরজিকে, সে-ও ইতোমধ্যেই পুডিং তৈরি করে বসে আছে, ওদিকে বাচ্চাকাচ্চাসহ তার রোগাটে স্ত্রী বেরিয়ে পড়েছে গরুর মাংস কিনতে।

ধীরে ধীরে কেটে গেল আরও কিছু সময়, সেই সাথে বাড়ল ঠাণ্ডা। এই ঠাণ্ডা

মানুষকে শুধু অনুভব করায় না, রীতিমত কামড়ে দেয়। অশুভ প্রেতাত্মাদের শায়েস্তা করার জন্যে অযথাই অনেক সময় ব্যয় করেছেন মহৎপ্রাণ সেইন্ট ডানস্ট্যান। অত খাটুনি না করে যদি এরকম ঠাণ্ডাকে শুধু আদেশ দিতেন প্রেতাত্মাগুলোর নাকে চিমটি কাটবার জন্যে, তাহলে অনেক সহজে কাজ উদ্ধার হত। একটা ছেলে পা টিপে টিপে এসে উঁকি দিল চাবির ফুটো দিয়ে। যে-শখ এই শহরের আর কেউ করবে না, সেই শখই হয়েছে তার–স্ক্রুজকে ক্রিসমাস ক্যারল শোনাবে। কিন্তু

'গড ব্লেস ইউ, মেরি জেন্টলম্যান!
মে নাথিং ইউ ডিসমে!'

–এটুকু গাইতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন স্ক্রুজ, টেবিলের ওপর থেকে রুলারটা তুলে নিয়ে এত জোরে তেড়ে এলেন যে, আতঙ্কে গলা শুকিয়ে গেল গায়কের, সোজা ছুটল সে রাস্তার দিকে।

ছেলেটাকে ধরতে না পেরে বিড়বিড় করতে করতে ফিরে এলেন স্ক্রুজ, বসে আবার হিসেবপত্র দেখতে লাগলেন। অবশেষে কাউন্টিং-হাউস বন্ধের সময় হয়ে এল। উঠে পড়লেন স্ক্রুজ, ইশারায় কেরানিকে জানিয়ে দিলেন ব্যাপারটা। আর এই অপেক্ষাতেই যেন ছিল বেচারি, মুহূর্তের মধ্যে মোমবাতি নিবিয়ে দিল সে, হ্যাট পরে নিল মাথায়।

'আগামীকাল বুঝি পুরো দিনটাই ছুটি নিতে চাও, তাই না?' চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন স্ক্রুজ।

'যদি আপনার কোন অসুবিধে না থাকে, স্যার।'

'অসুবিধে আছে,' বললেন স্ক্রুজ, 'তাছাড়া এভাবে ছুটি নেয়াটা ভালও দেখায় না। এ-জন্যে তোমার বেতন থেকে যদি আধ ক্রাউন কেটে নেই, তুমি ভাববে, আমি অন্যায় করলাম, তাই না?'

মৃদু হাসল কেরানি।

'অথচ তোমার কি একবারও মনে হয় না যে,' আবার বললেন স্ক্রুজ, 'পুরো একটা দিন কাজ না করা সত্ত্বেও মজুরি নিয়ে তুমি আমার সাথে অন্যায় করছ?'

অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কেরানি বুঝিয়ে বলল যে, এরকম ঘটনা তো বছরে মাত্র একবারই ঘটে।

'ওই এক দোহাই পেয়েছ!' ওভারকোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে বললেন স্ক্রুজ। 'কিন্তু এই দোহাই দিয়ে প্রত্যেক বছরের ২৫ ডিসেম্বর একজন লোকের পকেট ফাঁকা করে দেয়াটা খুব ভাল কথা নয়। যাই হোক, তোমাকে পুরো দিনই ছুটি দিলাম। অনেক দিন থেকে আছ এখানে, তোমার সাথে তো আর খারাপ ব্যবহার করতে পারি না। পরশু দিন সকাল সকাল আসবে কিন্তু!'

পরশু দিন সকাল সকালই আসবে বলে কথা দিল কেরানি; আর সাথে সাথে ফোঁৎ করে একটা শব্দ করে বেরিয়ে পড়লেন স্ক্রুজ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অফিসে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল কেরানিও। ওভারকোট নেই বলে দ্রুত ছুটতে হলো বেচারিকে, সাদা মাফলারটা উড়তে লাগল পতপত করে। কর্নহিলের কাছটায় পৌঁছুতে দেখল, একদল বাচ্চা ডিগবাজি দিচ্ছে বরফের ওপর, পিছলে নামছে ঢালু বেয়ে, আর খিলখিল করে হাসছে। আসন্ন ক্রিসমাসের সম্মানার্থে

ওদের সাথে বার বিশেক পিছল খেলো সে-ও, তারপর সোজা ছুটল ক্যামডেন অভিমুখে। বাড়ির সবার সাথে কানামাছি খেলতে হবে।

স্ক্রুজ চিরদিনই খাবার ব্যাপারটা সারেন বিশ্রী এক সরাইখানায়। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। খাওয়ার পর প্রতিদিনের মতই প্রত্যেকটা খবরের কাগজ পড়লেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এভাবেই বিকেল গড়িয়ে নেমে এল সন্ধ্যা। ব্যাঙ্কারস-বুক পড়ে অনেকটা সময় কাটিয়ে দেয়ার পর স্ক্রুজ ভাবলেন, আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে, এবার বাড়ি গিয়ে ঘুমাতে হবে। যে-ঘরটাতে তিনি থাকেন, সেখানেই থাকতেন তাঁর মৃত পার্টনার। একটা চত্বরের পর ছোট ছোট কয়েকটা ঘর নিয়ে তাঁর বাড়ি। বাড়িটা তৈরি হবার পর থেকে কখনোই সেটার একটু সংস্কার বা মেরামতের প্রয়োজন বোধ করেননি স্ক্রুজ। ফলে, খুবই পুরানো হয়ে গেছে বাড়িটা, আর সেই পরিমাণে নিঃসঙ্গ—কারণ, স্ক্রুজই এখানকার একমাত্র বাসিন্দা। কোণের দিকের একটা ঘরে তিনি থাকেন, বাদবাকি সবগুলো ঘর ব্যবহার করেন হিসেবপত্র দেখার কাজে। বাইরের চত্বরটা আজ এতই অন্ধকার যে, এখানকার প্রত্যেকটা পাথর চেনা সত্ত্বেও হাতড়াতে বাধ্য হলেন স্ক্রুজ। চত্বর পার হয়ে দরজার কাছে আসতে দেখলেন, ভারী কুয়াশা এমনভাবে ঝুলে আছে, যেন আবহাওয়ার দেবদূত স্বয়ং সেখানে গভীর শোকে নিমগ্ন।

দরজার কড়াটায় একবার হাত ছোঁয়াতে স্বস্তি পেলেন স্ক্রুজ। অবশ্য এমন কিছু বিশেষত্ব নেই কড়াটার, শুধু আর দশটা কড়ার চেয়ে এটা অনেকখানি বড়—এই যা। দিন-রাত-সকাল-বিকেল সব সময় কড়াটাকে দেখে আসছেন স্ক্রুজ। এখানে একটা কথা বলে নেয়া ভাল যে, হিসেব নিকেশ নিয়ে যত খিটিমিটিই করুন না কেন, স্ক্রুজ কিন্তু বেশ কল্পনাপ্রবণ। অনেক সময় সে-কল্পনাপ্রবণতা এমনকি লণ্ডনের পৌরসভার হোমরাচোমরাদের কিংবা ব্যবসায়ীসঙ্ঘের মীটিংয়ে আলোচিত বিষয়বস্তুকেও হার মানায়। অথচ আরেকটা আশ্চর্য ব্যাপার হলো, এত কল্পনাপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও আজ মাত্র একবার উল্লেখ করা ছাড়া এই সাত বছরের মধ্যে তাঁর মৃত পার্টনারের কথা তিনি কখনোই ভাবেননি। তো, এই কল্পনাপ্রবণতা নাকি অন্য কোন কারণে বলা মুশকিল, ঘটল অত্যাশ্চর্য এক ঘটনা। পকেট থেকে চাবি বের করলেন স্ক্রুজ। কিন্তু চাবির ফুটোয় চাবি ঢুকিয়ে দরজাটা খোলার আগে হঠাৎ কড়ার জায়গাটায় কড়ার বদলে দেখতে পেলেন মার্লের মুখ।

হ্যাঁ, মার্লের মুখ, কোন সন্দেহ নেই। আশেপাশের সমস্ত কিছু যেমন মিশে আছে অন্ধকারে, মুখটা কিন্তু তেমনভাবে মিশে নেই। বরং আলোর একটা দ্যুতি ছড়িয়ে আছে মুখটার চারপাশে, ঠিক যেমন পচা গলদা-চিংড়ি মৃদু আলো ছড়ায় অন্ধকার ঘরে। চোখ-দুটো সোজা তাকিয়ে আছে স্ক্রুজের দিকে। অবশ্য সে দৃষ্টিতে হিংস্রতা বা রাগের কোন ভাব নেই, বরং বেঁচে থাকতে যেভাবে তাকিয়ে থাকতেন, সেরকম নরম চোখেই তাকিয়ে আছেন মার্লে। ভূতুড়ে একটা চশমা দেখা যাচ্ছে ভূতুড়ে কপালের ওপর, যেন এইমাত্র ঠেলে ওটাকে ওপরে তুলে দিয়েছেন মার্লে। চুলগুলো উড়ছে অদ্ভুতভাবে। চোখদুটো প্রায় নিশ্চল হয়ে রইলেও সীসের মত রঙগুলোকে করে তুলেছে ভয়ঙ্কর। তবে ভালভাবে লক্ষ করলে মনে হয়, চোখদুটোর চেয়ে মুখটাই যেন ভয়ঙ্করত্বের আসল কারণ।

স্ক্রুজ হাঁ করে কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন জিনিসটার দিকে, বলতে পারবেন না। হঠাৎ চমকে উঠে তিনি খেয়াল করলেন, চোখের সামনে ঝুলছে অতি পরিচিত সেই কড়া।

শৈশব থেকেই ভয় কী জিনিস, স্ক্রুজ জানেন না। কিন্তু আজকের ঘটনায় ঠিক ভয় না পেলেও রক্ত চলাচল যে একটু দ্রুত হয়নি, এটা বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলেন স্ক্রুজ। নিজের অজান্তেই যে হাত টেনে নিয়েছিলেন চাবি থেকে, সেই হাত দিয়েই চাবি ঘুরিয়ে, তালা খুলে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। মোমবাতি জ্বাললেন।

দরজা বন্ধ করার আগে একটু ইতস্তত করলেন স্ক্রুজ। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখে নিলেন পেছনটা। তাঁর কেন যেন মনে হচ্ছিল, পেছন ফিরলেই দেখতে পাবেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন মার্লে, বাতাসে উড়ছে তাঁর বেণী। কিন্তু না। কড়ার স্ক্রু আর নাটগুলো ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না তাঁর। অযথা ভয় পেয়েছিলেন বলে মনে মনে নিজেকে গালি দিলেন স্ক্রুজ, তারপর 'ধুত্তোর!' বলে দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন দরজা।

পুরো বাড়িটা কেঁপে উঠল থরথর করে। মনে হলো, ওপরের দরজা-জানালাগুলোর সাথে সাথে নিচতলার মদ-ব্যবসায়ীর প্রত্যেকটা পিপেও যেন নড়ে উঠল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল তার প্রতিধ্বনি, যেন একটা প্রতিধ্বনি জন্ম দিচ্ছে আরেকটার। কিন্তু প্রতিধ্বনি শুনে ভয় পাবার পাত্র নন স্ক্রুজ। দরজায় খিল লাগিয়ে, হলঘর পেরিয়ে, ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন তিনি, আর উঠতে উঠতেই নিবিয়ে দিলেন মোমবাতিটা।

বাইরের রাস্তায় জ্বলছে ছয়টা গ্যাসের বাতি, কিন্তু ওগুলো বাড়ির ভেতরের অন্ধকার এতটুকু কমাতে পারেনি।

অবশ্য স্ক্রুজের এতে বিন্দুমাত্র যায় আসে না। বরং আলো জ্বাললেই পয়সা খরচ হয় বলে অন্ধকারকেই তিনি বেশি ভালবাসেন। কোনকিছুর সঙ্গে ধাক্কা কিংবা হোঁচট না খেয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকলেন স্ক্রুজ। কিন্তু দরজা বন্ধ করার আগে ভাবলেন, অন্য ঘরগুলোয় একবার করে নজর বুলানো উচিত। আজ কড়ার ওপরে মার্লের মুখ দেখার পর থেকে কেন যেন বারবার মনে পড়ছে কথাটা।

একে একে প্রত্যেকটা ঘরে গেলেন তিনি। সবগুলোই ঠিক আগের মত আছে, কোন পরিবর্তন হয়নি কোথাও। কেউ বসে নেই টেবিলের নিচে, সোফার নিচ থেকেও উঁকি দিচ্ছে না কেউ; অত্যন্ত মৃদু একটা আগুন জ্বলছে ফায়ারপ্লেসে; চামচ আর গামলাও যথাস্থানেই আছে; জইয়ের মণ্ড ভরা পাত্রটা তাকের ওপর যেখানটায় রেখে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে সরে যায়নি একটুও। গত কয়েক দিন ধরে মাথাটা ভারী হয়ে থাকায় একটু করে জইয়ের মণ্ড খাচ্ছেন স্ক্রুজ। হামাগুড়ি দিয়ে এবারে উঁকি দিলেন খাটের নিচে, কেউ নেই; ক্লজিটেও নেই কেউ; দেয়ালের গায়ে ঝোলানো ড্রেসিং-গাউনটা সামান্য বাঁকা হয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ জাগল মনে, কিন্তু ওটার ভেতরেও লুকিয়ে নেই কেউ। এমনকি অকেজো জিনিসপত্র রাখার ঘরটাও যেমন ছিল তেমনি আছে। ঠিক আছে উনুনের জাফরি, পুরানো জুতোজোড়া, মাছের ঝুড়ি দুটো, আগুন খোঁচানোর লোহার দণ্ডটা। তিন পায়ের

ওপর তেমনি দাঁড়িয়ে আছে ওয়াশিং-স্ট্যাণ্ড।

পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হয়ে দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন স্ক্রুজ। হঠাৎ কি মনে করে জীবনে এই প্রথমবারের মত লাগালেন আরেকটা তালা। তারপর গলায় বাঁধা রুমালটা খুলে, ড্রেসিং-গাউন পরে, পায়ে চটি গলিয়ে, মাথায় চড়ালেন নাইটক্যাপ। অবশেষে জইয়ের মণ্ডের পাত্রটা নিয়ে গিয়ে বসলেন ফায়ারপ্লেসের ধারে।

এমন ভয়ঙ্কর শীতার্ত রাত, অথচ আগুনটা এতই মৃদু যে, একেবারে পাশে বসে, ফায়ারপ্লেসের ওপরে ঝুঁকে না পড়া পর্যন্ত উত্তাপ টেরই পেলেন না স্ক্রুজ। ফায়ারপ্লেসটা খুবই পুর‍্যানো, বহু দিন আগে তৈরি করেছেন ওলন্দাজ কোন ব্যবসায়ী। চারপাশে লাগানো হয়েছে মনোরম ওলন্দাজ টালি, আর সেগুলোর ওপরে বাইবেলের অনুসরণে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নানারকম চিত্র। হাবিল-কাবিলের চিত্র আছে সেখানে, আছে ফেরাউনের কন্যা, শেবার রানী, ইব্রাহীম (আঃ), বেলশাজ্জার, যিশুর প্রধান শিষ্যবর্গ। এছাড়াও, পালকের বিছানার মত মেঘের রাশির ভেতর দিয়ে উড়ে আসছে দেবদূতের দল—এবং মানুষের মনকে আকৃষ্ট করার মত আরও অনেক চিত্র। কিন্তু চিত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্ক্রুজের মনে হলো, সবগুলো মুছে গিয়ে যেন ভেসে উঠল মার্লের মুখ। মনে হলো, টালিগুলোর যদি চিত্র ফোটানোর ক্ষমতা থাকত, তাহলে সবগুলো চিত্রকে বিদেয় করে প্রত্যেকটা টালিই ফুটিয়ে তুলত মার্লের মুখ। অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলেন স্ক্রুজ। সাত বছর আগে মরে যাওয়া সত্ত্বেও এই উৎপাত কেনরে বাবা!

'যত্তসব!' বলে উঠে পড়লেন তিনি; পুরো ঘরে বেশ কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর এসে বসলেন আবার।

মাথাটা চেয়ারের পেছনদিকে এলিয়ে দিতেই চোখে পড়ল একটা ঘণ্টা। ঘণ্টাটা খুবই পুরানো, বহু দিন থেকেই ঝুলছে ওখানে। অনেক আগে তিনি কি যেন করতেন ঘণ্টাটা দিয়ে। কিন্তু ঠিক কী করতেন, বহু চেষ্টা করেও কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। হঠাৎ চমকে উঠে তিনি খেয়াল করলেন, ঘরে কোন বাতাস নেই, অথচ ঘণ্টাটা মৃদু মৃদু দুলছে। প্রথমটায় এত ধীরে ধীরে দুলল যে কোন শব্দই হলো না। তারপর হঠাৎ করেই ভীষণ শব্দে বেজে উঠল ঘণ্টাটা, সাথে সাথে বেজে উঠল বাড়ির সবগুলো ঘণ্টা। সম্মিলিত সেই ঘণ্টাধ্বনিতে পুরো বাড়িটা যেন কাঁপতে লাগল থরথর করে।

বড়জোর আধ কিংবা এক মিনিট ধরে বাজল ঘণ্টাগুলো। কিন্তু স্ক্রুজের মনে হলো, ওগুলো যেন বেজে চলেছে পুরো এক ঘণ্টা ধরে। তারপর ঠিক যেমন হঠাৎ করে বাজতে শুরু করেছিল, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল। একটু পরেই নিচতলা থেকে ভেসে এল ধাতুতে ধাতুতে ঠোকাঠুকির মত একটা শব্দ, ভারী শেকল টেনে টেনে যেন হাঁটছে কেউ। চকিতে স্ক্রুজের মনে পড়ে গেল, হানাবাড়িগুলোতে ভূতেরা নাকি ঠিক এমনি করে শেকল টেনে টেনে হাঁটে।

ভীষণ শব্দে খুলে গেল নিচতলার কোন দরজা, সেইসাথে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল অদ্ভুত শব্দটা। কিছুক্ষণ আশেপাশে ঘোরাঘুরির পর শব্দটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে

এল ওপরতলায়, সোজা এগিয়ে আসতে লাগল তাঁর ঘরের দিকে।

'এসব কী শুরু হলো রে, বাবা!' বিড়বিড় করতে লাগলেন স্ক্রুজ। 'আমি এসব বিশ্বাস করি না।'

ভূতে বিশ্বাস করেন না–এ-কথা বললেও মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল স্ক্রুজের। শব্দটা এক মুহূর্তের জন্যে থামল দোরগোড়ায়, তারপর ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে দপ্ করে লাফিয়ে উঠল আগুনের শিখাটা, যেন বলে উঠল, 'আমি চিনতে পেরেছি ওকে; মার্লের ভূত!' তারপরেই আবার কমে গিয়ে ধারণ করল স্বাভাবিক রূপ।

সেই মুখ, অবিকল সেই মুখ। পরনে ওয়েস্টকোট, টাইটস্ আর বুট। মাথার চুলগুলো তেমনি খাড়া হয়ে আছে, পেছনদিকে উড়ছে বেণীটা। কোমরের কাছে বাঁধা রয়েছে শেকল। স্ক্রুজ ভালভাবে লক্ষ করে দেখলেন, শেকলটা বেশ লম্বা, পেছনদিকে ঝুলে আছে লেজের মত: আর তার সাথে বাঁধা রয়েছে ক্যাশ-বাক্স, চাবির গোছা, কয়েকটা তালা, জমা-খরচের খাতা, দলিল আর ইস্পাতের তৈরি ভারী ভারী মানিব্যাগ। শরীরটা একেবারে স্বচ্ছ। ওয়েস্টকোটের পিঠের কাছের ছোট ছোট দুটো বোতাম পরিষ্কার দেখতে পেলেন স্ক্রুজ।

তিনি মানুষজনকে অনেক বারই বলাবলি করতে শুনেছেন যে, মার্লের নাড়িভুঁড়ি বলতে কিছু নেই, কিন্তু বিশ্বাস করেননি। আজ বিশ্বাস করলেন।

অবশ্য এ-কথা ঠিক যে, পুরো ব্যাপারটা তিনি এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। জিনিসটা অবশ্য একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, চোখে যে দৃষ্টি ফুটে আছে, সেটাও খুব সুবিধের নয়, কিন্তু তাতেই বা কী? মাথায় আবার বাহারি একটা রুমাল বাঁধা রয়েছে, কই বেঁচে থাকতে তো এ রকমভাবে রুমাল বাঁধার অভ্যেস ছিল না! মোট কথা, জিনিসটাকে নিয়ে বেশ মুশকিলেই পড়ে গেলেন স্ক্রুজ। তাঁর বোধবুদ্ধি চিরদিনই বলে এসেছে, পৃথিবীতে ভূত বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করাও বড় সোজা কথা নয়।

'কেমন আছ?' অবশেষে বলে উঠলেন স্ক্রুজ। 'তা এতদিন পর আমার কাছে কী দরকার?'

'অনেক দরকার আছে!–হ্যাঁ, মার্লের গলাই তো, উঁহুঁ, কোন সন্দেহ নেই।'

'তুমি কে?'

'তার চেয়ে বলো, আমি কে ছিলাম।'

'তুমি কে ছিলে?' গলা একটু চড়িয়ে বললেন স্ক্রুজ।

'বেঁচে থাকতে আমি ছিলাম তোমার পার্টনার–জেকব মার্লে।'

'তুমি–তুমি কি বসতে পারো?' একদৃষ্টে তাকিয়ে সন্দেহভরে জানতে চাইলেন স্ক্রুজ।

'নিশ্চয়।'

'বসো তো দেখি!'

এই প্রশ্ন করার পেছনে একটা মতলব ছিল স্ক্রুজের। তিনি ভেবেছিলেন ভূতের মত একটা জিনিস যাদের দেহ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, তাদের পক্ষে চেয়ারে বসার

মত একটা ব্যাপার সহজ না-ও হতে পারে। যদি সত্যি তা-ই হয়, নিশ্চয় খুব ঝামেলায় পড়ে যাবে ভূতটা। সেক্ষেত্রে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে চাই কি চলেও যেতে পারে। কিন্তু তাঁর ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণ করে ফায়ারপ্লেসের উল্টোদিকের চেয়ারটায় এমনভাবে বসে পড়ল ভূতটা, যেন এরকম বসা তার অনেক দিনের অভ্যেস।

'তাহলে আমাকে তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না?' নরম গলায় জানতে চাইল ভূত।

'না,' বললেন স্ক্রুজ।

'চোখের সামনে দেখেও যখন বিশ্বাস করতে পারছ না, তখন বলো, কী প্রমাণ দিলে বিশ্বাস করবে?'

'জানি না,' বললেন স্ক্রুজ।

'নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর সন্দেহের কারণ?'

'এজন্যে যে,' বললেন স্ক্রুজ, 'খুব সামান্য কারণে মানুষের বিচারবুদ্ধি গুলিয়ে যেতে পারে। বদহজম হলে চোখে ভুল দেখা এমন কিছু অসম্ভব নয়। ঠিকমত হজম না হওয়া কয়েক টুকরো গরুর মাংস, এক দলা পনির কিংবা ভালভাবে সেদ্ধ না হওয়া একটা আলুই মানুষের মাথা গোলমাল করে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট। হয়তো সে কারণেই সম্পূর্ণ ফাঁকা একটা ঘরে আমি তোমার মত একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি।'

আসলে পেট কিন্তু মোটেই খারাপ করেনি স্ক্রুজের, এরকম রসিকতা করার কোন ইচ্ছেও তাঁর ছিল না। ভূতকে কথা বলতে শুনে জীবনে এই প্রথমবারের মত ভীষণ ভয় পেয়েছেন স্ক্রুজ। আর তাই এসব বলে ভূতটাকে বোঝাতে চাইছিলেন, মোটেই ভয় পাননি তিনি।

কথা বলতে বলতে নিজের অজান্তেই চোখ নামিয়ে ফেলেছিলেন স্ক্রুজ। আবার তাকাতে দেখলেন, ভূতটা ঠিক তেমনিভাবেই বসে আছে চেয়ারে। নিশ্চল চোখের ওই জ্বলন্ত দৃষ্টি কি কোন মানুষ সইতে পারে? তাছাড়া, ওটার চারপাশে যেন বিরাজ করছে নারকীয় একটা আবহাওয়া। চোখে দেখতে না পেলেও পরিষ্কার অনুভব করতে পারছেন স্ক্রুজ। কারণ, ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যেন অদৃশ্য কোন চুলোর গরম বাষ্পে ধীরে ধীরে উড়ছে ওটার চুল আর ওয়েস্টকোটের ঝুল।

'দাঁত খোঁচানোর এই খড়কেটা দেখতে পাচ্ছ?' এভাবে চুপচাপ বসে থাকলে মাথাটা আরও খারাপ হয়ে যাবে ভেবে আবার কথা বলে উঠলেন স্ক্রুজ। অবশ্য এই প্রশ্ন করার পেছনে আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। তিনি চাইছিলেন অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ভয়ঙ্কর ওই দৃষ্টিটা তাঁর মুখের ওপর থেকে অন্যদিকে সরিয়ে দিতে।

'পাচ্ছি,' জবাব দিল ভূত।

'তুমি তো এদিকে তাকাওনি।'

'তাকাই বা না তাকাই,' গলা চড়িয়ে বলল ভূত, 'দেখতে ঠিকই পাচ্ছি।'

'বেশ!' বললেন স্ক্রুজ, 'এখন এই খড়কেটা যদি আমি খেয়ে ফেলি, তাহলে

আগামী কয়েকদিন ধরে আমার চারপাশ ঘিরে নেচে বেড়াবে ভূতের দল। কিন্তু তাদের কোনটাই আসল নয়, সবই মনগড়া। সত্যি বলতে কি, এসব মানুষের পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। যত্তসব!'

এ-কথা শোনার সাথে সাথে ভীষণ একটা চিৎকার দিয়ে উঠল ভূতটা। তারপর এত জোরে জোরে শেকলটা বাজাতে লাগল যে, চেয়ারের একটা হাতল আঁকড়ে ধরে অতি কষ্টে মূর্ছা যাওয়ার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করলেন স্ক্রুজ। কিন্তু ভয়াবহ একটা দৃশ্য অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্যে। বদ্ধ ঘরে যেন খুব গরম লাগছে এমন ভঙ্গি করে মাথার রুমালটা খুলে ফেলল ভূতটা, আর সাথে সাথে তার নিচের চোয়ালটা ঝুলে পড়ল বুকের ওপর!

এবারে আর চেয়ারে বসে থাকতে পারলেন না স্ক্রুজ, হাঁটু ভেঙে মেঝেতে পড়ে গিয়ে দু-হাতে মুখ ঢাকলেন। বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, এবার দয়া করে থামো! কিন্তু তুমি আমার সাথে এরকম করছ কেন? কী এমন ক্ষতি করেছি আমি তোমার?'

'হায়রে, মানুষ! পার্থিব চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নেই মাথায়,' বলল ভূত, 'এখনও বলো, আমাকে বিশ্বাস করো কিনা?'

'করি,' বললেন স্ক্রুজ। 'বিশ্বাস আমাকে করতেই হবে। কিন্তু ভূতেদের কি নিজের রাজ্য ছেড়ে পৃথিবীতে আসা উচিত? আর যদি আসেও, এত জায়গা থাকতে আমার বাড়িতে কেন?'

'কারণ, প্রত্যেক মানুষেরই যথাসাধ্য ভ্রমণ করা উচিত। শুধু বিদেশেই নয়, দেশেও যাবার মত অনেক জায়গা আছে। প্রত্যেকেরই উচিত তাদের আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও সহকর্মীদের বাড়িতে যাওয়া। যারা বেঁচে থাকতে এই কাজ করে না, মরার পর তাদের ঘাড়ে চাপে সেই দায়। কোথাও স্থির থাকতে পারে না তারা, ঘুরে বেড়াতে হয় সারা পৃথিবী জুড়ে। সে যে কী কষ্ট, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি আমি। অথচ বেঁচে থাকতে কাজগুলো সেরে রাখলে এখন কত সুখে থাকতে পারতাম!'

কথা শেষ করেই আবার চিৎকার করে উঠল ভূতটা, তারপর ভীষণ জোরে বাজাতে লাগল শেকল।

'তোমার কোমরে এভাবে শেকল বাঁধা রয়েছে কেন?' কাঁপতে কাঁপতে জানতে চাইলেন স্ক্রুজ।

'এই শেকল আমার নিজের তৈরি,' জবাব দিল ভূত। 'এর প্রত্যেকটা ইঞ্চি আমার হাতে গড়া। বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে তৈরি করেছি এই শেকল, তারপর ধীরে ধীরে লম্বা করেছি সেটাকে। মরার পরে তাই এটাকে বেঁধেছি কোমরের সাথে–সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেয়। এটার গঠনকৌশল কি খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছে তোমার?'

আরও কাঁপতে লাগলেন স্ক্রুজ।

'নাকি এরকম একটা শেকল তুমিও বয়ে বেড়াচ্ছ?' আবার বলে উঠল ভূত। 'তাহলে অবশ্য শেকল সম্বন্ধে তোমাকে জ্ঞান দান করা বৃথা। জানো, আমার এই শেকলটা সাত বছর আগেও ঠিক এমনি ভারী ছিল। এই ক'বছরে

তোমারটার ওজন নিশ্চয় আরও বেড়েছে। উহ্, যে বয়, একমাত্র সে-ই জানে এর ভার!'

চমকে উঠে নিজের চারপাশে চেয়ে দেখলেন স্ক্রুজ। তিনি ভেবেছিলেন, আড়াইশো কিংবা তিনশো ফুট লম্বা একটা শেকলে নিজেকে জড়ানো অবস্থায় দেখতে পাবেন। কিন্তু আশেপাশে সেরকম কিছু নেই।

'জেকব,' বললেন স্ক্রুজ, 'ভাই জেকব মার্লে, দয়া করে আমাকে একটু শান্তির বাণী শোনাও।'

'ওরকম কোন বাণী আমার জানা নেই,' বলল ভূত। 'তাছাড়া, শান্তি অন্য রাজ্যের জিনিস, এব্‌নেজার স্ক্রুজ। সেখানকার নিয়ম-কানুন, মানুষজন সবই আলাদা। সত্যি বলতে কি, সে রাজ্য যে চোখে দেখেনি, তাকে বলে বোঝানো অসম্ভব। সেখান থেকে কিছু শান্তি পাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি বললেই চলে। কোথাও থাকতে পারি না আমি, বিশ্রাম নিতে পারি না এক দণ্ড। জীবনে কাউন্টিং-হাউসের বাইরে যাইনি কখনও। ঘাড় গুঁজে শুধু বসে থেকেছি আর টাকা গুণেছি। এখন মেটাতে হচ্ছে তার দায়। ঘুরছি, শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছি। এবং জানি না, ক্লান্তিকর এই যাত্রা শেষ হবে কখন!'

গভীরভাবে চিন্তা করার সময় পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয়া স্ক্রুজের চিরাচরিত অভ্যেস। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভূতের কথার অর্থগুলো চিন্তা করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু মাথা ওপরদিকে তুললেন না, মেঝে থেকেও উঠলেন না।

কিছুক্ষণ পর বললেন, 'তোমার এই ভ্রমণ নিশ্চয় খুব ধীরগতির ছিল, জেকব।' কথাগুলো স্ক্রুজ বেশ নরম গলায় বললেও বলার ধরনটা ছিল পাকা ব্যবসায়ীর মত।

'ধীরগতির!' বলল ভূত।

'সাত বছর আগে মারা গেছ,' বললেন স্ক্রুজ। 'আর তারপর থেকে শুধু ভ্রমণই করছ!'

'হ্যাঁ, সারাটা সময়,' বলল ভূত। 'কোন বিশ্রাম নেই, কোন শান্তি নেই। সেইসাথে চলছে বিবেকের অন্তহীন দংশন।'

'দ্রুত ভ্রমণ করেছ?' জানতে চাইলেন স্ক্রুজ।

'বাতাসের পাখায় ভর দিয়ে,' জবাব দিল ভূত।

'তাহলে তো সাত বছরে অনেক দেশ ভ্রমণ করার কথা,' চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন স্ক্রুজ।

কথায় বিদ্রূপের আভাস পেয়ে আবার ভয়ঙ্কর একটা হুঙ্কার ছাড়ল ভূতটা। তারপর এত জোরে বাজাতে লাগল শেকলটা যে, খানখান হয়ে গেল রাতের স্তব্ধতা।

স্ক্রুজ মনে মনে ভাবলেন, এখন যদি কোন প্রহরী এসে উপদ্রবের দায়ে ভূতটাকে পাকড়াও করে নিয়ে যায়, তাকে মোটেই দোষ দেয়া যাবে না।

'আরে নশ্বর মানুষের দল,' চেঁচিয়ে উঠল ভূতটা, 'কিছুই জানো না তোমরা। একবারও ভাব না, কত বড়বড় শেকলে বাঁধা পড়ে আছ। মনে রেখো, একদিন

সবাইকে চলে যেতে হবে এই পৃথিবী ছেড়ে। অবশ্য ভাল মানুষদের জন্যে এটা কোন চিন্তার কারণ নয়। তারা বরং অনন্তকাল সুখে থাকার জন্যে দু-দিনের এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারলেই বাঁচে। সমস্যা হলো তোমার কিংবা আমার মত মানুষদের নিয়ে। আমরা কখনোই ভাবি না, জীবন মাত্র একটাই। আর সে-জীবনে ভুল করলে পরে হাজার আপসোস করেও কোন লাভ হবে না। ভুল করেছি আমি! হ্যাঁ, ভুল করেছি সারাটা জীবন ধরে!'

'কিন্তু তোমার আপসোসের কোন কারণ তো দেখতে পাচ্ছি না, জেকব,' বললেন স্ক্রুজ, 'ব্যবসায়ী হিসেবে বেশ সফল ছিলে তুমি।'

'ব্যবসা!' হাত মোচড়াতে মোচড়াতে আবার চেঁচিয়ে উঠল ভূতটা। 'ব্যবসা করেছি মানুষকে নিয়ে! দয়া, ক্ষমা, দান, পরোপকার–এসব সদগুণগুলোকে পর্যন্ত ব্যবহার করেছি ব্যবসায়িক স্বার্থে। হায়রে দানশীলতা! যা দান করব, তার দশগুণ লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার পরেই কেবল খুলে গেছে আমাদের দানের হাত!'

ঝট করে শেকলটা উঁচুতে তুলে ধরল ভূতটা, যেন ওটাই তার সমস্ত যন্ত্রণার মূল, পরক্ষণেই সশব্দে ছেড়ে দিল মেঝের ওপর।

'বছরের এই সময়টাতেই আমার কষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি,' বলল ভূত, 'এ সময় আমার ছোটাছুটি সবচেয়ে বেড়ে যায়। মানুষের বাড়ি বাড়ি যাই, দেখি তাদের জীবনযাত্রা। কিন্তু কারও মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি না। কারণ, জীবনে যা কখনোই পারিনি, এরা তা পারছে অনায়াসে। এক আত্মীয় যাচ্ছে আরেক আত্মীয়ের বাড়ি, এক বন্ধু যাচ্ছে আরেক বন্ধুর বাড়ি। এমনকি জ্ঞানীগুণী মানুষেরা পর্যন্ত কোনরকম দ্বিধা না করে যাচ্ছে গরীবদের বাড়িতে!'

ভূতের আলোচনার বিষয়বস্তু মোটেই ভাল লাগল না স্ক্রুজের, আরও কাঁপতে লাগলেন।

'শোনো, শোনো!' চেঁচিয়ে উঠল ভূত। 'আর খুব বেশিক্ষণ আমি থাকতে পারব না এখানে।'

'শুনব, নিশ্চয় শুনব,' বললেন স্ক্রুজ। 'কিন্তু আমাকে এভাবে কষ্ট দিয়ো না, জেকব। এই রূপ ধরে আমার সামনে বসে থেকো না! তোমাকে অনুরোধ করছি!'

'বুঝতে পারছি না, কোন রূপে দেখা দিলে ভাল লাগবে তোমার। আমি অবশ্য দিনের পর দিন তোমার পাশে বসে থেকেছি। অদৃশ্য হয়ে থাকতাম বলে দেখতে পাওনি তুমি।'

কথাটা শুনেই গা ছমছম করে উঠল স্ক্রুজের, ভ্রূ থেকে ঘাম মুছে ফেললেন তিনি।

'অনেক দিন থেকেই ভেবেছি,' বলল ভূত, 'দেখা দেব তোমাকে। শেষমেশ আজকের রাতটাকেই বেছে নিলাম প্রায়শ্চিত্ত করব বলে। দেখো, এব্‌নেজার, আজ আমি এখানে এসেছি তোমাকে সাবধান করে দিতে। এখনও সময় আছে, সাবধান হও। এমন কাজ কোরো না, যাতে আমার ভাগ্য বরণ করে নিতে হয়।'

'সাবধান না করে কি তুমি পারো, তুমি যে আমার বন্ধু ছিলে,' বললেন স্ক্রুজ। 'ধন্যবাদ!'

'একটা কথা বলে রাখি তোমাকে,' বলল ভূত, 'পরপর তিনটে ভূত আসবে

তোমার বাড়িতে।'

কথাটা শোনার সাথে সাথে ভূতটার মতই নিচের চোয়ালটা প্রায় বুকের ওপরে ঝুলে পড়ল স্ক্রুজের।

বললেন, 'এতদিন পরে পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছ এরকম একটা কথা বলার জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি ওদের সাথে দেখা করতে চাই না,' বললেন স্ক্রুজ। 'উঁহুঁ, দেখা তোমাকে করতেই হবে,' বলল ভূত, 'নইলে নিজেকে শোধরাতে পারবে না। আগামীকাল রাতে যখন ঘণ্টাটা একবার বেজে উঠবে, ঠিক তখনই এসে হাজির হবে প্রথম ভূত।'

'একবারে সবগুলোকে হাজির করে ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলা যায় না, জেকব?' বললেন স্ক্রুজ।

'দ্বিতীয় ভূতটা আসবে পরশু রাতে, ওই একই সময়ে। তৃতীয়টা আসবে তার পরের রাতে। বারোটার শেষ ঘণ্টার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই এসে হাজির হবে সে। আমাকে আর খুঁজো না। পাবে না। তার চেয়ে বরং আর একটা মুহূর্তও নষ্ট না করে নজর দাও নিজের দিকে। আমার পরিণতি তো চোখের সামনেই দেখলে!'

কথা বলতে বলতেই টেবিল থেকে রুমালটা তুলে নিয়ে আগের মত মাথার সাথে বেঁধে নিল ভূতটা। রুমালটা হাতে নিতে দেখেই মাথা নামিয়ে ফেলেছিলেন স্ক্রুজ। চোয়ালে চোয়ালে খট করে বাড়ি লাগার শব্দ কানে আসতে বুঝলেন, বাঁধা শেষ। একটু পর সাহস করে মাথা তুললেন স্ক্রুজ। দেখলেন, শেকলের খানিকটা ঘাড়ে তুলে নিয়ে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভূতটা।

স্ক্রুজের দিকে তাকিয়ে পিছাতে লাগল ভূতটা। এক-পা করে পিছায়, আর একটু করে খুলে যেতে থাকে জানালা। এভাবে পিছাতে পিছাতে যখন জানালার কাছে গিয়ে পৌঁছুল ভূতটা, জানালার দুটো পাল্লাই তখন হাট হয়ে খুলে গেছে দু-দিকে।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে স্ক্রুজকে কাছে যাবার ইশারা করল ভূতটা। সাথে সাথে এগোতে লাগলেন স্ক্রুজ। দু-ধাপের মধ্যে পৌঁছুতে হাত তুলে থামতে ইশারা করল মার্লের ভূত। স্ক্রুজ থামলেন।

তবে তাঁর এই থামার পেছনে ভূতের আদেশ যতটা না কাজ করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করেছে ভয় এবং বিস্ময়। ভূতটা হাত তুলতেই তাঁর কানে এসেছে একটা গোলমালের শব্দ। একসাথে যেন এগিয়ে আসছে অনেকগুলো লোক। কান পাততে স্ক্রুজ বুঝতে পারলেন, বিলাপ করছে তারা, বুক চাপড়াচ্ছে অনুশোচনায়। কিসের এত দুঃখ তাদের, ঠিক বুঝতে না পারলেও স্ক্রুজের মনে হলো, এই দুঃখের সাথে যেন মিশে রয়েছে অভিযোগ। আর সেই অভিযোগ নিজেরই বিরুদ্ধে। ভূতটাও কান পেতে শুনল সেই শব্দ, তারপর চিৎকার করে যোগ দিল বিলাপে। কিছুক্ষণ পর উড়ে উঠে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে, দেখতে দেখতে মিশে গেল হিমেল রাতের অন্ধকারে।

এতক্ষণে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন স্ক্রুজ, এবারে আর কৌতূহল দমন করতে পারলেন না। ছুটে গেলেন তিনি জানালার ধারে, সামান্য ঝুঁকে পড়ে দৃষ্টি মেলে দিলেন বাইরে।

অবাক হয়ে দেখলেন, রাতের আকাশ ভরে গেছে ভূতে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে বেড়াচ্ছে তারা, যেন শান্তি পাচ্ছে না কোথাও। আর এই ছুটোছুটির সময় এক মুহূর্তের জন্যেও চুপ করে থাকতে পারছে না। বিলাপ করছে। গোঙাচ্ছে।

মার্লের ভূতের মতই একটা করে শেকল বাঁধা রয়েছে প্রত্যেকের কোমরে। শুধু এক জায়গায় কয়েকটা ভূত বাঁধা রয়েছে একই শেকলে–বেঁচে থাকতে এই ক'জন খুব সম্ভবত সরকারী কর্মচারী ছিল। অন্তত একজন হলেও মুক্ত আছে কিনা, সেটা দেখার জন্যে চারিপাশে আরেক বার ভাল করে নজর বুলালেন স্ক্রুজ। নেই

বেশ কয়েকটা ভূতকে চিনতে পারলেন স্ক্রুজ, বেঁচে থাকতে ওদের সাথে পরিচয় ছিল তাঁর। বিশেষ করে সাদা ওয়েস্টকোট পরা একটা বুড়ো ভূতকে চিনতেন খুব ভালভাবে। বিশাল একটা লোহার সিন্দুক বাঁধা রয়েছে তার গোড়ালির সাথে। ছোট্ট একটা বাচ্চা নিয়ে বাড়ির দরজার সামনে বসে আছে দুঃস্থ এক মহিলা। তাকে সাহায্য করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে ভূতটা, কিন্তু না পেরে কাঁদছে করুণ সুরে। স্ক্রুজ এবার পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন ভূতগুলোর বিলাপের কারণ। যে কোনভাবেই হোক মানুষকে সাহায্য করতে চাইছে তারা, কিন্তু পারছে না। বেঁচে থাকতে যে-কাজটা তারা অনায়াসে করতে পারত, মরার পরে সেই শক্তি হারিয়ে ফেলেছে চিরতরে।

আরও বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল এভাবে। তারপর ভূতগুলোই হারিয়ে গেল কুয়াশায়, নাকি কুয়াশাই ঢেকে ফেলল তাদের, স্ক্রুজ ঠিক বুঝতে পারলেন না, কিন্তু তাদের কণ্ঠ আর শুনতে পেলেন না তিনি। চোখ রগড়ে আবার তাকালেন তিনি সামনের দিকে, রাত বয়ে চলেছে কোটি বছরের পুরানো সেই রাতের মত।

জানালা বন্ধ করে দিলেন স্ক্রুজ, তারপর যে-দরজা দিয়ে ভূত ঢুকেছিল সেটা পরীক্ষা করে দেখলেন। নিজের হাতে যেভাবে লাগিয়েছিলেন, এখনও ঠিক সেভাবেই লাগানো রয়েছে তালাদুটো, খিলও খোলা নেই। তিনি কেবল বলতে যাচ্ছিলেন 'যত্তসব!' কিন্তু কি যেন মনে করে আর বললেন না। হঠাৎ ভীষণ ক্লান্তি পেয়ে বসল তাঁকে–সেটা সারাদিনের খাটুনির জন্যে, নাকি ভূতের দল দেখে, নাকি ভূতটার সাথে কথা বলে, অথবা রাত গভীর হওয়ায়–স্ক্রুজ ঠিক বুঝতে পারলেন না। সোজা বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি, কাপড়-চোপড় না ছেড়েই এলিয়ে দিলেন শরীরটা, এবং মুহূর্তের মধ্যেই তলিয়ে গেলেন ঘুমের গভীরে।

দ্বিতীয় স্তবক

প্রথম ভূতের আগমন

ঘুম ভাঙতেই স্ক্রুজ দেখলেন, ঘরটা ছেয়ে আছে অন্ধকারে। সে অন্ধকার এত গাঢ় যে, কোথায় দেয়াল আর কোথায় জানালা, ঠাহর করা যায় না। চোখ বড় বড় করে অন্ধকার ভেদ করতে চাইলেন স্ক্রুজ, কিন্তু কোন লাভ হলো না। ঠিক এইসময় বেজে উঠল আশপাশের কোন গির্জার ঘড়ি। একে একে সিকি ঘণ্টার চারটে সঙ্কেত জানাল ঘড়িটা। সুতরাং ঘণ্টাধ্বনি শোনার জন্যে কান খাড়া করলেন স্ক্রুজ।

তাঁকে চরম বিস্মিত করে বেজে চলল ভারী ঘণ্টাটা। ষষ্ঠ ঘণ্টার পরে পড়ল সপ্তম, তারপর অষ্টম, এভাবে বাজতে বাজতে বারোটায় গিয়ে থামল। বারোটা! চমকে উঠলেন স্ক্রুজ। তিনি তো ঘুমিয়েছেন রাত দুটোর পরে। নিশ্চয় নষ্ট হয়ে গেছে ঘড়িটা। তুষারখণ্ড ঢুকে পড়েছে ওটার ভেতরে। তা না হলে বারোটা বাজবে কীভাবে!

এমনভাবে ভ্রূকুটি করলেন স্ক্রুজ, যেন পৃথিবীতে ওটার চেয়ে খারাপ ঘড়ি আর একটাও নেই। তারপর স্পর্শ করলেন নিজের রিপীটারের স্প্রিং। ইচ্ছে করলে এই ঘড়িটাতে ঘণ্টার সঙ্কেতের পুনরাবৃত্তি করানো যায়। পর পর বারো বার কেঁপে উঠল স্প্রিংটা।

'কিন্তু তা কি করে হয়,' আপনমনে বলে উঠলেন স্ক্রুজ, 'পুরো একটা দিন এবং সন্ধ্যা পার করে রাত বারোটা পর্যন্ত ঘুমানো কি সম্ভব? এখন দুপুর বারোটা বাজে, সেটা ভাবারও উপায় নেই। পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হলেও চারপাশ এত অন্ধকার হবে না।'

ভাবতেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। বয়স হয়েছে, ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাচ্ছেন না তো? বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন স্ক্রুজ, সোজা ছুটে গেলেন জানালার দিকে। তুষারপাতের ফলে আচ্ছন্ন হয়ে আছে জানালার কাচ। ড্রেসিং-গাউনের হাতা দিয়ে মুছতে কিছুটা পরিষ্কার হলো। চোখ তীক্ষ্ণ করে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু ভারী কুয়াশা ভেদ করে চোখ চলল না। শুধু অনুভব করলেন, ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে। এবারে কান পাতলেন। কিন্তু লোক চলাচল কিংবা কোলাহলের কোন শব্দ পেলেন না। অথচ দুপুর বারোটা হলে এসব শব্দ কানে আসার কথা। অর্থাৎ, সত্যিই এখন তাহলে রাত বারোটা!

ধীরে ধীরে হেঁটে গিয়ে স্ক্রুজ আবার গা এলিয়ে দিলেন বিছানায়। রাজ্যের চিন্তা ভিড় করে এল মনে। বারবার, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আজকের ব্যাপারটা চিন্তা করলেন তিনি। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। যতই চিন্তা করলেন, ততই হতভম্ব হলেন। আর যতই চিন্তা করবেন না বলে ঠিক করলেন, ততই আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

মার্লের ভূত তাঁকে চূড়ান্ত অতিষ্ঠ করে ছাড়ল। বারবার গোড়া থেকে

ব্যাপারটা ভাবতে লাগলেন স্ক্রুজ, সত্যিই কি মার্লের ভূত তাঁর সামনে এসে কথা বলেছিল, নাকি পুরো ব্যাপারটাই একটা দুঃস্বপ্ন? এ-নিয়ে আর একটুও চিন্তা করবেন না বলে যতই ইচ্ছেশক্তি খাটাতে লাগলেন স্ক্রুজ ততই প্রবল শক্তিতে বারবার ছুটে আসতে লাগল সেই একই চিন্তা, 'ব্যাপারটা কি স্বপ্ন নাকি অন্য কিছু?'

একরকম আচ্ছন্নের মত পড়েছিলেন স্ক্রুজ, হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন পৌনে একঘণ্টার সঙ্কেত শুনে। বারোটার পরে পৌনে একঘণ্টা, অর্থাৎ পৌনে একটা বাজে—ভাবলেন স্ক্রুজ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল, একটার সময়েই তো প্রথম ভূতটার আসার কথা। আর ঘুমানোর চেষ্টা করে লাভ নেই বুঝতে পেরে এই পনেরোটা মিনিট শেষ হবার অপেক্ষা করতে লাগলেন স্ক্রুজ।

কিন্তু সময়টুকু এতই দীর্ঘ মনে হতে লাগল যে, অন্তত দু'-বার স্ক্রুজ ভাবলেন, হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি, তাঁর অজান্তে অনেক আগেই বেজে গেছে একটা। এরকম দ্বিধায় দুলতে দুলতে হঠাৎ তার কানে ভেসে এল ঘড়ির শব্দ।

'ডিং, ডং!'

'সিকি ঘণ্টা,' মনে মনে বললেন স্ক্রুজ।

'ডিং, ডং!'

'আধ ঘণ্টা!' বললেন স্ক্রুজ।

'ডিং, ডং!'

'পৌনে একঘণ্টা,' বললেন স্ক্রুজ।

'ডিং, ডং!'

'এই তো ঘণ্টা পুরল,' বিজয়ীর গলায় বললেন স্ক্রুজ, 'কিন্তু ভূত-টুত কিছুই তো দেখছি না!'

কথাটা স্ক্রুজ বলে ফেলেছিলেন ঘণ্টা পড়ার আগেই। সুতরাং কথা শেষ হবার প্রায় সাথে সাথেই ভেসে এল একটামাত্র গম্ভীর, বিষণ্ন ঘণ্টাধ্বনি। দপ করে তীব্র একটা আলো জ্বলে উঠল ঘরের ভেতরে, আর ঠিক তখনই কে যেন টান দিল বিছানার চাদর।

হ্যাঁ। স্ক্রুজ একটুও নড়েননি, তবু সরে গেল বিছানার চাদর পরিষ্কার বোঝা গেল, চাদরটা ধরে টান দিল কেউ। ব্যাপারটা কি দেখার জন্যে এক হাতে ভর দিয়ে উঠে বসতেই স্ক্রুজ দেখতে পেলেন ভূতটাকে, একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

মুহূর্তে ঘুমের রেশটুকুও উধাও হয়ে গেল স্ক্রুজের, চোখ বড় বড় করে চাইলেন তিনি। ভূতের চেহারাটা অদ্ভুত। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় মুখটা যেন কোন শিশুর, পরক্ষণেই মনে হয় ওটা বুড়ো মানুষের মুখ, আরও ভাল করে দেখলে মনে হয়, মুখটা বুড়োরই কিন্তু অতিপ্রাকৃত কোন মাধ্যমের ভেতর দিয়ে দেখার জন্যে আকারে হ্রাস পেয়ে শিশুর মত লাগছে। লম্বা, ঘন, সাদা চুল কোমর ছাড়িয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে। চুল দেখে মনে হয়, বয়সের কারণে পেকে গেছে, অথচ একটা বলিরেখাও নেই মুখে, সুন্দর মসৃণ চামড়া। হাতদুটো বেশ লম্বা আর পেশীবহুল, যেন এই হাতে একবার আটকা পড়লে আর ছাড়া পাবার কোন উপায়

নেই। পা দুটো এবং পায়ের পাতা অত্যন্ত চমৎকার। পরনে দুধসাদা একটা টিউনিক; কোমরে চকচকে একটা বেল্ট। হাতে হলির একটা ডাল ধরে আছে সে। সাজসজ্জার মধ্যে একটা জিনিসই একটু বেখাপ্পা, আর সেটা হলো, তার পোশাকের এখানে-সেখানে আটকে রাখা ফুলগুলো। এখন শীতকাল, অথচ তার পোশাকে শোভা পাচ্ছে গ্রীষ্মের ফুল। তবে, সবচেয়ে বেশি অবাক হতে হয় তার মাথার দিকে তাকালে। কপাল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে উজ্জ্বল একটা আলো, যে আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে ঘরের একটা পাশ। ভাল করে লক্ষ করলেই বোঝা যায়, আলোটা সে ব্যবহার করে শুধুমাত্র প্রয়োজনের সময়। একটা টুপি গোঁজা আছে তার বাহুর নিচে। ব্যবহার করতে না চাইলে ওই টুপি দিয়ে আলোটা ঢেকে রাখে সে।

আরও বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর স্ক্রুজ বুঝলেন, নির্দিষ্ট কোন আশ্চর্যজনক জিনিস ভূতটার চেহারা কিংবা পোশাক-আশাকে নেই, বরং তার সবকিছুতেই আছে অবাক হবার মত ব্যাপার। এই যেমন এতক্ষণ সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছিল অসময়ের ফুল আর কপালের আলোটাকে, অথচ এখন সে-আলো আবার বিদ্যুতের মত চমকাতে শুরু করেছে–থেকেই পড়ছে এখানে, থেকেই ওখানে। কখনও মনে হচ্ছে ভূতটার একটা মাত্র হাত, কখনও মনে হচ্ছে একটা মাত্র পা। একবার মনে হয় বিশটা পা, আবার পরক্ষণেই দেখা যাচ্ছে দুটো পা। হঠাৎ দেখা যাচ্ছে মাথা নেই, আবার মনে হচ্ছে শুধু মাথা আছে, শরীর নেই। অবশ্য দেহের একটামাত্র অংশে আলো পড়ে বাদবাকি সমস্তটুকু আঁধারে থাকাতেই এমনটা মনে হচ্ছে। অবাক এই দৃশ্য চলতে চলতেই হঠাৎ করে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল আলোটা, দৃষ্টিগোচর হলো ভূতটার সম্পূর্ণ শরীর।

'স্যার, আপনিই কি সেই ভূত, যাঁর আসার কথা আমাকে জানানো হয়েছে?' বললেন স্ক্রুজ।

'হ্যাঁ, আমিই সেই ভূত!'

কণ্ঠস্বরটা বেশ মিষ্টি আর শান্ত। একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ কথা বলছে যেন অনেক দূর থেকে।

'তো, আপনি কে, মানে আমি বলতে চাইছি, কোন্ জাতের ভূত?' জানতে চাইলেন স্ক্রুজ।

'আমি অতীতকালের ক্রিসমাসের ভূত।'

'সুদূর অতীতের?'

'না। তোমার অতীতের।'

হঠাৎ অদ্ভুত একটা ইচ্ছে জাগল স্ক্রুজের। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, কেন জাগল, তিনি বলতে পারবেন না–স্রেফ জাগল এই আর কি! ভূতটাকে টুপি পরা অবস্থায় দেখার ইচ্ছে হলো তাঁর এবং কথাটা মনে হবার প্রায় সাথেসাথেই তিনি অনুরোধ করলেন ভূতটাকে।

'কি বললে!' ধমকে উঠল ভূতটা, 'দয়াপরবশ হয়ে তোমার জন্যে যে আলো নিয়ে এলাম, তোমার নোংরা হাতে এত শিগগির সেটাকে নিবিয়ে দিতে চাও? তোমার মত নোংরা মনের মানুষেরাই তো তৈরি করেছে এই টুপি। তোমাদের

জন্যেই তো বাধ্য হই এই টুপি মাথায় দিতে। তখন আলোটা ঢাকা পড়ে যায়, তোমাদের সুপথে আনার আর কোন উপায় থাকে না।'

ভূতটার এই তত্ত্বকথা স্ক্রুজের মোটেই ভাল লাগল না। ভূতের টুপি তৈরি করার ব্যাপারে আবার তাঁর কি ভূমিকা থাকতে পারে! তবে ভূতটাকে আর বিরক্ত করবেন না–মনে মনে এটা ঠিক করে সবিনয়ে জানতে চাইলেন তার আগমনের কারণ।

'আমি এসেছি তোমার মঙ্গলের জন্যে!' জবাব দিল ভূত।

ভূতটার কথা শুনে এমন ভাব করলেন স্ক্রুজ, যেন কৃতার্থ হয়েছেন। কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, রাত জেগে ভূতের বকবক শোনার চেয়ে ঘুমালেই তো মঙ্গল হত বেশি। স্ক্রুজের মনের কথাটা বুঝতে পেরেই যেন ভূতটা সাথে সাথে বলে উঠল:

'ঠিক মঙ্গলের জন্যে নয়, আমি আসলে এসেছি তোমাকে শোধরাতে। এখন আমার দিকে মনোযোগ দাও!'

কথা বলতে বলতে সবল একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ভূতটা, এবার সে-হাতে ধরে ফেলল স্ক্রুজের একটা বাহু।

'ওঠো! চলো আমার সাথে!'

একসাথে অনেকগুলো কথা বলতে চাইলেন স্ক্রুজ। বলতে চাইলেন, রাতের এই সময়টা হাঁটার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। আবহাওয়াও খুব একটা ভাল যাচ্ছে না। এখন বাইরে যাওয়ার চেয়ে বরং বিছানার উষ্ণতায় নিজেকে সঁপে দেয়াটাই সমীচীন। বেশ কয়েক দিন আগেই তাপমাত্রা নেমে গেছে শূন্যের নিচে, অথচ এই মুহূর্তে তাঁর পরনে আছে শুধু পাতলা একটা গাউন, মাথায় নাইটক্যাপ, পায়ে একজোড়া চটি। কিন্তু ভূতের সাথে তর্ক করে লাভ নেই বুঝে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে উঠে দাঁড়ালেন স্ক্রুজ। ভূতটা সোজা এগিয়ে গেল জানালার দিকে, চমকে উঠে তার টিউনিকের একটা প্রান্ত চেপে ধরলেন তিনি

বললেন, 'দেখুন, আমি অতি সামান্য মরণশীল মানুষ, আপনার পড়ে যাবার ভয় না থাকলেও আমার তো সে ভয় আছে!'

'আমার হাতটা শুধু আলতো করে চেপে ধরো এখানে,' স্ক্রুজের হৃৎপিণ্ডের জায়গাটা নির্দেশ করল ভূতটা, 'তাহলে আর পড়ে যাবার ভয় থাকবে না।'

কথা বলতে বলতেই দেয়াল পেরিয়ে ফাঁকা একটা জায়গায় এসে পৌঁছুলেন স্ক্রুজ। চোখের পলকে উধাও হয়েছে শহর, চারপাশে বার বার তাকিয়েও তার কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না। জায়গাটার দুই পাশেই শস্যখেত। শহরের সাথেই উধাও হয়েছে আঁধার আর কুয়াশা। ঠাণ্ডা এখানেও আছে, রাস্তার ওপরে বরফ পড়ে আছে এখানে-সেখানে, কিন্তু একেবারে ঝকঝক করছে চারদিক।

'হায় ঈশ্বর!' নিজের অজান্তেই হাততালি দিয়ে উঠলেন স্ক্রুজ, 'এটাই তো আমার দেশ! এখানেই কেটেছে আমার শৈশব!'

নরম চোখে তার দিকে চাইল ভূতটা। আলতোভাবে স্ক্রুজকে ধরে আছে সে, প্রায় মেয়েদের মত নরম তার হাতের তালু, অথচ সে-স্পর্শে যেন রয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার অনুভব। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে অনেক রকম সুগন্ধ, এর প্রত্যেকটাকেই সে আলাদা আলাদাভাবে চেনে। প্রত্যেকটার সাথেই জড়িয়ে

রয়েছে হাজারটা চিন্তা, আশা, আনন্দ, বেদনা আর উৎকণ্ঠা–যেসব সে বিস্মৃত হয়েছে অনেক আগেই।

'তোমার ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে,' বলল ভূত, 'আর গালের ওপরে ওগুলো কি?'

বিড়বিড় করে স্ক্রুজ জানালেন যে, ওগুলো ফুসকুরি। তারপরে এগোবার জন্যে মিনতি করলেন ভূতটাকে। সে যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যেতে রাজি আছেন তিনি।

'রাস্তা চিনতে পারছ?' জানতে চাইল ভূত।

'শুধু চেনা!' চেঁচিয়ে উঠলেন স্ক্রুজ, 'আমার চোখ বেঁধে দিলেও যেতে পারব এই রাস্তা দিয়ে।'

'অথচ এতগুলো বছর কিনা ভুলে ছিলে এখানকার কথা!' বলল ভূত। 'চলো, এগোনো যাক।'

রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলল দু'জনে। প্রত্যেকটা বাড়ির দরজা, খুঁটি, গাছ চিনতে পারলেন স্ক্রুজ। অবশেষে বেশ কিছুটা সামনে দেখা গেল একটা গঞ্জের মত জায়গা। কাছেই একটা সেতু, একটা গির্জা, বাঁক নিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট নদী। বালকদের পিঠে নিয়ে এগিয়ে চলেছে কয়েকটা টাট্টু ঘোড়া, ছেলেগুলো আবার গরুর গাড়িতে বসে থাকা আরেক দল ছেলের উদ্দেশে চেঁচাচ্ছে। প্রাণোচ্ছল ছেলেগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে শেষমেশ গান জুড়ে দিল। তাদের গান শুনতেই যেন শস্যখেত দুলিয়ে দিয়ে হাজির হলো বাতাস!

'এগুলো কিন্তু অতীতকালের ছেলেদের ছায়া, এদের কেউ আর এখন অত ছোট নেই,' বলল ভূত। 'সুতরাং বুঝতেই পারছ, আমাদের উপস্থিতি ওরা মোটেই টের পাবে না।'

এগিয়ে আসতে লাগল ছেলেগুলো। একেবারে কাছে আসতে অবাক হয়ে স্ক্রুজ দেখলেন, সবাই তাঁর অত্যন্ত পরিচিত–এমন কি প্রত্যেকের নামও মনে আছে। কিন্তু এদের দেখে এত আনন্দ হলো কেন? কেন চক্‌চক্ করে উঠল এতদিনের ঠাণ্ডা চোখজোড়া? ওরা পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে বুকটাই বা অমন মোচড় দিয়ে উঠল কেন? পরস্পর পরস্পরকে ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে ওরা। কিন্তু ক্রিসমাসে তো তাঁর কিছু আসে যায় না! ক্রিসমাস কোন্ কাজে লেগেছে তাঁর? তবু ওদের মুখের ওই ক্রিসমাস-শুভেচ্ছা শুনে অদ্ভুত এক ভাল লাগার আবেশে অন্তরটা আপ্লুত হয়ে উঠছে কেন?

'স্কুলটা কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে যায়নি,' বলল ভূত। 'একটা ছেলে রয়ে গেছে এখনও, যাকে তার সহপাঠীদের কেউই পছন্দ করে না।'

ছেলেটি তাঁর পরিচিত, বলে ফুঁপিয়ে উঠলেন স্ক্রুজ।

এবারে বড় রাস্তা ছেড়ে অতি পরিচিত একটা গলি ধরে এগিয়ে চলল দু'জনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাওয়া গেল ফিকে লাল রঙের ইটের তৈরি একটা দালান। ছাদের ওপর ওয়েদারককসহ ছোট্ট একটা গম্বুজ, আর সেই গম্বুজের সাথে ঝুলছে একটা ঘণ্টা। দালানটা বেশ বড় হলেও অযত্ন আর অবহেলার শিকার। প্রায় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে প্রশস্ত অফিসগুলো, নোনা ধরেছে

দেয়ালে, ভেঙে গেছে জানালা, দরজার পাল্লা পচে প্রায় খসে পড়ার অবস্থা। পাশেই শূন্য আস্তাবলে কক্ কক্ করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছে মুরগির দল। কোচ-হাউস আর ছাউনিগুলো ঢেকে গেছে ঘাসের জঙ্গলে। বাইরের মত অবস্থা দালানটার ভেতরেও। স্যাঁতসেঁতে দেয়ালঅলা সারি সারি ঘর, কিন্তু কোনটাই সাজানো গোছানো নয়। গা ছমছম করা একটা শূন্যতা যেন জড়িয়ে আছে দালানটাকে।

ভূতটার সাথে হলঘর পেরিয়ে পেছনদিকের একটা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন স্ক্রুজ। আস্তে করে খুলে গেল দরজাটা। স্ক্রুজ দেখলেন বিষণ্নতার চাদর মুড়ি দেয়া লম্বা, ফাঁকা একটা ঘর। সারি সারি ডেস্কগুলো ঘরটার শূন্যতাকে আরও প্রকট করে তুলেছে। চারপাশে জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন নেই, শুধু কোণের দিকে একটা ডেস্কে বসে পড়াশোনা করছে ছোট্ট একটা ছেলে। আস্তে করে একটা ডেস্কে বসে পড়লেন স্ক্রুজ, চোখের সামনে নিজের বিস্মৃত প্রায় শৈশবকে দেখে কাঁদতে লাগলেন নিঃশব্দে।

ক্ষীণতম কোন প্রতিধ্বনিও ভেসে আসছে না বাড়ির কোথাও থেকে, প্যানেলের পেছন থেকে চিঁ চিঁ করছে না কোন ইঁদুর, টিপ টিপ করে পানি পড়ছে না ওয়াটার-স্পাউট থেকে, খসখস করছে না পপলারের পাতা, মৃদুমন্দ বাতাসে দুলছে না ভাঁড়ারের দুয়ার, খুটখাট শব্দ নেই ফায়ারপ্লেসে। ভীষণ এই নিস্তব্ধতা আরও উতলা করে তুলল স্ক্রুজকে, চোখ বেয়ে পানি পড়তে লাগল দরদর করে।

তাঁর বাহুর ওপরে একটা হাত রাখল ভূতটা, আঙুল নির্দেশ করল নিবিষ্টমনে পাঠরত বালক স্ক্রুজের দিকে। হঠাৎ জানালার কাছে দেখা গেল বিদেশী পোশাক পরা একটা লোককে। পিঠে কাঠবোঝাই একটা গাধার লাগাম ধরে আছে সে, কোমরবন্ধের সাথে ঝুলছে একটা কুড়াল

'আরে, এ তো আলিবাবা!' আনন্দে চিৎকার দিয়ে উঠলেন স্ক্রুজ। 'হ্যাঁ, আলিবাবা! বুড়োকে আমি ভাল করেই চিনি! অনেকদিন আগের এক ক্রিসমাসে ওই ছেলেটার সামনে হাজির হয়েছিল সে। আর ভ্যালেটাইন, আর তার বুনো ভাই অরসন: কিছুক্ষণ পর সবাই মিলে চলে গিয়েছিল ওইদিকে! আর দামেস্কের তোরণের কাছে গভীর নিদ্রায় শায়িত লোকটার নাম যেন কি? ওকে আপনি দেখেননি? আর সেই যে ভূতটা, সুলতানের সহিসকে ঝুলিয়ে রেখেছিল মাথা নিচের দিকে করে। বেশ করেছিল! কী দরকার ছিল ব্যাটার রাজকুমারীকে বিয়ে করার!'

শৈশব নিয়ে একেবারে মেতে উঠলেন স্ক্রুজ। হাসি আর কান্নার মাঝামাঝি এক অদ্ভুত গলায় কথা বলে চললেন তিনি। শহুরে ব্যবসায়ী বন্ধুরা এ-অবস্থায় তাঁকে দেখলে খুবই অবাক হত।

'ওই তো, সেই তোতাপাখিটা!' আবার চেঁচিয়ে উঠলেন স্ক্রুজ। 'সবুজ শরীর আর হলুদ লেজ, মাথার একেবারে ওপরদিকে লেটুসের মত কি যেন একটা জিনিস: ওই তো! রবিনসন ক্রুসোকে সে বলে–বেচারি। দ্বীপের চারপাশটা ঘুরে আবার বাসায় ফিরতেই রবিনসন ক্রুসোকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে সে, ''কোথায়

গিয়েছিলে?" নিশ্চয় তুমি চেনো তোতাটাকে। আর ওই যে ফ্রাইডে, প্রাণভয়ে ছুটে চলেছে ছোট্ট খাঁড়িটার দিকে! এই, ফ্রাইডে! এই ব্যাটা!'

অনেকক্ষণ ধরে এভাবে একনাগাড়ে কথা বলার পর বালক স্ক্রুজের দিকে তাকিয়ে 'আহা বেচারি!' বলেই আবার কেঁদে উঠলেন তিনি।

শেষমেশ চোখ মুছে হাতদুটো পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, 'ইস, যদি সেই কাজটা করতাম! কিন্তু এখন আর তা কোনমতেই সম্ভব নয়, অনেক দেরি হয়ে গেছে!'

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল ভূত।

'না,' বললেন স্ক্রুজ। 'কিছু না। গত রাতে একটা ছেলে আমার দরজার কাছে এসে ক্রিসমাস ক্যারল গাইছিল। আজ তাকে কিছু দেয়ার ইচ্ছে হচ্ছে আমার।'

কী যেন চিন্তা করে হেসে উঠল ভূতটা। তারপর হাত নাচিয়ে বলল, 'চলো, আরেকটা ক্রিসমাস দেখা যাক!'

ভূতের কথাটা শেষ হতে না হতেই খানিকটা বড় হয়ে গেল বালক স্ক্রুজ, ঘরটা হয়ে গেল আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন, আরও নোংরা অদৃশ্য হয়ে গেল প্যানেলের কিছু অংশ, ফেটে গেল জানালার পাল্লা; ছাদ থেকে প্লাস্টার খসে বেরিয়ে পড়ল নিচের ইট। বালক স্ক্রুজ কিন্তু এসব পরিবর্তনের কিছুই টের পেল না। অন্য দিনগুলোর মতই আজও সে একাকী।

তবে আজ পড়াশোনায় মগ্ন নয় সে, পায়চারি করছে ঘরটার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। ভূতটার দিকে চাইলেন স্ক্রুজ, তারপর দরজার দিকে।

দরজা খুলে গেল; ছুটে এসে ঘরে ঢুকল ছোট্ট একটি মেয়ে, দু-হাতে তার গলা জড়িয়ে চুমু খেতে খেতে ডাকতে লাগল 'ভাই ভাই' বলে

'আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি!' বলে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল সে। 'হ্যাঁ, বাড়ি যাবে তুমি। বাড়ি, বাড়ি, বাড়ি!'

'বাড়ি?' বলল ছেলেটা।

'হ্যাঁ!' আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ 'বাড়ি যাবে তুমি। চিরদিনের জন্যে আর কখনোই তোমাকে পালাতে হবে না। এক রাতে শুতে যাবার আগে বাবা আমার সাথে এমন গল্প জুড়ে দিলেন যে সাহস করে বলেই ফেললাম তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা। রাজি হলেন বাবা। ওই দেখো, তোমার জন্যে গাড়ি পাঠিয়েছেন। আর কখনোই তোমাকে আসতে হবে না এখানে। খুব মজা হবে এবার ক্রিসমাসে। এমন আনন্দ করব, যেমনটা পৃথিবীতে আর কেউ কখনও করেনি।'

'বেশ পাকা পাকা কথা শিখেছিস তো তুই!' বলল বালক।

আবার হাততালি দিয়ে হেসে উঠল মেয়েটি, পায়ের পাতায় ভর দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইল ভাইকে। তারপর টেনে নিয়ে যেতে লাগল হাত ধরে। উপায়ান্তর না দেখে ছেলেটিও নিজেকে সমর্পণ করল বোনের এই শিশুসুলভ চপলতায়।

'মেয়েটির সৌন্দর্য দেখে মনে হয়, যেন কারও নিঃশ্বাসের ছোঁয়াতেও বিবর্ণ হয়ে যেতে পারে ও,' বলল ভূত। 'তবে ওর অন্তরটা ছিল চিরদিনই বড়!'

'হ্যাঁ,' বললেন স্ক্রুজ। 'ঠিকই বলেছ।'
'ও মারা গেছে বড় হয়ে,' বলল ভূত, 'খুব সম্ভব, বাচ্চাকাচ্চাও ছিল।'
'একটা ছেলে,' বললেন স্ক্রুজ।
'ঠিক,' বলল ভূত। 'তোমার ভাগনে!'
ভূতের এই কথায় কেন যেন সামান্য অস্বস্তি বোধ করলেন স্ক্রুজ। তারপর বললেন, 'হুঁ।'
এদিকে স্কুলটা ছেড়ে আসার প্রায় সাথে সাথে দু'জনে পৌঁছে গেছে শহরের এক রাস্তায়। চারপাশে ছুটে চলেছে ব্যস্ত মানুষ, গাড়িঘোড়া। এক গাড়ি আরেক গাড়িকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবার প্রতিযোগিতায় মত্ত। আর, সবকিছুর মিলিত কোলাহলে গমগম করছে জায়গাটা। দোকানপাটগুলোর সাজসজ্জার দিকে চোখ পড়তেই বোঝা যাচ্ছে: ক্রিসমাস আসন্ন। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে, জ্বলে উঠেছে রাস্তার দু-পাশের বাতি।
একটা গুদামের দরজার কাছে থেমে গেল ভূতটা। জানতে চাইল, স্ক্রুজ এটাকে চেনেন-কিনা।
'চিনি মানে!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন স্ক্রুজ। 'এখানেই তো আমার কর্মজীবনের হাতেখড়ি!'
দু'জনে ঢুকে পড়ল গুদামের ভেতরে। একটা হাই ডেস্কের পেছনে বসে আছে এক বুড়ো, মাথায় পরচুলা। ডেস্কটা এত উঁচু যে বুড়ো আর ইঞ্চিদুয়েক লম্বা হলেই তার মাথা ঠুকে যেত ছাদের সঙ্গে।
ভীষণ উত্তেজিত হয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলেন স্ক্রুজ, 'আরে, এ তো বুড়ো ফেজিউয়িগ! ঈশ্বর ওকে শান্তিতে রাখুন; ভাবতেই পারিনি, আবার কখনও দেখব বুড়োকে!'
হাতে ধরা কলমটা নামিয়ে রেখে ঘড়ি দেখল ফেজিউয়িগ। সাতটা বাজে। হাতদুটো ঘষে ওয়েস্টকোটটা টেনেটুনে ঠিক করল বুড়ো। প্রফুল্ল স্বরে বলে উঠল:
'এব্‌নেজার! ডিক! এসো, এদিকে এসো!'
দেখা গেল, স্ক্রুজ এখন যুবক। সঙ্গের শিক্ষানবিসের সাথে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সে।
'ওর আসল নাম ডিক উইলকিন্‌স্‌,' ভূতকে বললেন স্ক্রুজ। 'খুব ভালবাসতাম ওকে। আরে, এ যে সত্যিই ডিক! কেমন আছিস রে, শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা?'
'শোনো বাছারা,' বলল ফেজিউয়িগ। 'আজ রাতে আর কোন কাজ করতে হবে না। ক্রিসমাস, ডিক। ক্রিসমাস, এব্‌নেজার! চলো, এবার ঝটপট তুলে দেয়া যাক শাটারগুলো,' জোরে হাততালি দিয়ে উঠল বুড়ো।
যে-দ্রুততার সাথে ওরা শাটার তোলার কাজটা শেষ করল, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বুড়োর কথা শেষ হতে না হতেই শাটার হাতে তীরবেগে তারা ছুটে গেল রাস্তায়। এক, দুই, তিন–শাটার তুলতে লাগল তারা–চার, পাঁচ, ছয়–শাটারগুলো আটকে দিল পরস্পর–সাত, আট, নয়–বারো গোনা শেষ করার আগেই নয়টা শাটার তুলে দিয়ে ফিরে এল তারা, হাঁপাতে লাগল

রেসের ঘোড়ার মত।

'বাহ্!' চিৎকার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল বুড়ো ফেজিউয়িগ। 'এবার ঝটপট জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলো দেখি, বাছারা, অনেক জায়গার দরকার হবে আমাদের! হাত লাগাও, ডিক! ঝটপট, এব্‌নেজার!'

এবারেও ছোকরা দুটো দেখিয়ে দিল, পরিষ্কার করা কাকে বলে! পরিষ্কার করা যায়, এমন কিছুই বাদ রাখল না তারা। সমস্ত টুকিটাকি ঢুকিয়ে ফেলল বস্তায়, যেন আর কখনোই বের করার দরকার পরবে না ওগুলো। সারা মেঝেতে পানি ঢেলে ঝাঁট দিয়ে দিল, কমিয়ে দিল বাতি, কাঠ সাজিয়ে রাখল ফায়ারপ্লেসে। সব কাজই যেন হয়ে গেল চোখের পলকে। প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে ফেজিউয়িগ শুধু দেখল, গুদামটা পরিবর্তিত হয়ে গেল বলরুমে।

একটু পরেই স্বরলিপির খাতা হাতে ঘরে ঢুকল এক বেহালাবাদক। তারপর একমুখ হাসি নিয়ে মিসেস ফেজিউয়িগ। তার পেছনে পেছনে ফেজিউয়িগের তিন মেয়ে। তাদের পেছনে প্রেমকাতর ছয় যুবক। আর তাদের পরে এল আর সবাই। পরিচারিকা সাথে করে নিয়ে এসেছে তার রুটিওয়ালী খালাতো বোনকে। রাঁধুনি সাথে করে নিয়ে এসেছে তার ভাইয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু গোয়ালাকে। রাস্তার ওপাশের ছেলেটা এসে লুকোনোর চেষ্টা করছে তার পাশের বাড়ির মেয়েটির পেছনে। এভাবেই আসছে সবাই, একের পর এক। কেউ লজ্জিত মুখে, কেউ গট্‌গট্ করে, কেউ চমৎকার ভঙ্গিতে, কেউ বিশ্রীভাবে, কেউ অন্যকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে, আবার কেউ বা কাউকে টানতে টানতে। এর পরেই শুরু হলো নাচ বেশ কিছুক্ষণ পর 'চমৎকার' বলে হাততালি দিয়ে সবাইকে থামার ইঙ্গিত করল বুড়ো ফেজিউয়িগ। বেহালাবাদক ছুটে গিয়ে মুখ ডুবিয়ে দিল পোর্টারের পাত্রে। তারপর আবার শুরু হলো তার বাজনা। যেন আগের সেই ক্লান্ত-শ্রান্ত বেহালাবাদক আর সে নয়, তার জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তরতাজা এক নতুন বেহালাবাদক।

বেহালাবাদকের সাথে যোগ না দিলেও পরে আবার নাচল সবাই, থামল, আরও নাচল। আর এই নাচের ফাঁকে ফাঁকে এল কেক, নেগাস, বিশাল এক টুকরো ঠাণ্ডা রোস্ট, আলু আর বাঁধাকপি সহযোগে ঠাণ্ডা মাংস, কিমার চপ আর প্রচুর পরিমাণে বিয়ার। সবশেষে স্ত্রীকে নিয়ে নাচতে লাগল বুড়ো ফেজিউয়িগ। মজার ব্যাপার, এই বয়সেও নাচের অনেকরকম কসরত দেখাল তারা এবং নিখুঁতভাবে।

অবশেষে রাত এগারোটায় ভাঙল এই পারিবারিক বলনাচের আসর। দরজার একপাশে গিয়ে দাঁড়াল ফেজিউয়িগ, আরেকপাশে তার স্ত্রী। একে একে সবাই মেরি ক্রিসমাস জানাল ফেজিউয়িগ দম্পতিকে, তারপর বিদায় নিল। রয়ে গেল শুধু দুই শিক্ষানবিশ। ফেজিউয়িগ দম্পতির সাথে হাত মিলিয়ে মেরি ক্রিসমাস জানাল তারাও, তারপর গিয়ে শুয়ে পড়ল গুদামঘরের পেছনদিকে।

পুরো সময়টা একেবারে অনড় হয়ে রইলেন স্ক্রুজ। আসলে যুবক স্ক্রুজকে দেখতে দেখতে হারিয়ে ফেলেছিলেন নিজেকে। সেদিনের প্রত্যেকটি কথা, প্রতিটি মুহূর্ত মনে পড়ে গেছে তাঁর। ডিক আর যুবক স্ক্রুজ মুখ ফিরিয়ে নিতেই কেবল তার মনে পড়ল পাশে দাঁড়ানো ভূতটার কথা। তাকাতেই দেখলেন, জ্বলজ্বলে

চোখে তাঁর দিকে চেয়ে আছে ভূতটা।

ওদিকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফেজিউয়িগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে ডিক আর যুবক স্ক্রুজ।

'এই তুচ্ছ ব্যাপারেই দেখছি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই ওদের,' বলল ভূত।

'তুচ্ছ ব্যাপার!' বললেন স্ক্রুজ।

'নয়ত কী? পুরো অনুষ্ঠানটির জন্যে কতই বা খরচ হয়েছে বুড়োর? তিন কিংবা বড়জোর চার পাউণ্ড। তাহলে খরচের তুলনায় প্রশংসা কি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?'

'না,' রাগত গলায় বললেন স্ক্রুজ, 'মোটেই বেশি হচ্ছে না। এই পৃথিবীতে ফেজিউয়িগদের মত মানুষ অত্যন্ত বিরল। স্রেফ কথা বলে তারা মানুষকে আনন্দিত করে তুলতে পারে। ব্যাপারটা এমনই দুর্লভ, অর্থ দিয়ে তার মূল্য নিরূপণ করা যায় না। অবশ্য এসব আপনি ঠিক বুঝবেন না।'

থামলেন স্ক্রুজ।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল ভূত।

'তেমন কিছু নয়,' জবাব দিলেন স্ক্রুজ।

'উঁহুঁ, নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে,' জিদের সুরে বলল ভূত।

'না,' বললেন স্ক্রুজ। 'এইমাত্র আমার কেরানির সাথে দু-একটা কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল–ব্যস, আর কিছু নয়।'

ওদিকে বাতি নিবিয়ে দিল যুবক স্ক্রুজ। প্রায় সাথে সাথেই দু'জনে এসে দাঁড়াল খোলা আকাশের নিচে।

'আমার সময় শেষ হয়ে আসছে,' বলল ভূত। 'তাড়াতাড়ি! খুব তাড়াতাড়ি!'

কথাটা আপনমনে বললেও তৎক্ষণাৎ ঘটল একটা ঘটনা। আবার দেখা গেল স্ক্রুজকে। বয়স আরও বেড়েছে। চঞ্চল চোখজোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে, কমনীয়তা মুছে গিয়ে মুখে ফুটে উঠেছে লোভের ছাপ।

শোকের পোশাক পরে পাশেই বসে আছে সুন্দরী একটি মেয়ে, দু-চোখ বেয়ে পানি ঝরছে তার।

'আমার জন্যে আর কিছুই যায় আসে না তোমার,' নরম গলায় বলল মেয়েটি। 'একটা নতুন জিনিস আমার জায়গা দখল করে বসেছে। এতদিন ধরে তোমাকে আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করেছি, তোমাকে সুখী দেখতে চেয়েছি। এখন সেই জিনিসই যদি তোমাকে সুখ আর আনন্দ দিতে পারে, দুঃখ পাবার কিছুই থাকবে না আমার।'

'জিনিসটা কি শুনি?'

'সে এক মহামূল্যবান জিনিস।'

'তুমি যা-ই বলতে চাও না কেন, এ-কথা সত্যি যে, পৃথিবীতে দারিদ্র্যের চেয়ে ভয়াবহ আর কিছু নেই।'

'পৃথিবীকে তুমি বড় বেশি ভয় পাও, তাই না?' বলল মেয়েটি। 'আর সেজন্যেই ধীরে ধীরে সমস্ত সদ্‌গুণ হারিয়ে তোমার মাথায় এখন শুধু লাভের চিন্তা।'

'তার চেয়ে বলো, আগের চেয়ে অনেক চালাক হয়েছি আমি। তাতে কী এমন ক্ষতি হয়েছে? তোমাকে তো আমি এখনও ঠিক আগের মতই ভালবাসি।'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি।

'বলো, বাসি না?'

'আজ মনে পড়ছে সেই দিনগুলোর কথা, যখন তুমি আমাকে পাগলের মত ভালবাসতে। তখন অনেক গরীব ছিলে তুমি। আমরা স্বপ্ন দেখতাম, পরিশ্রম করে ফুলে-ফলে সাজিয়ে তুলব জীবনটা। তারপর ধীরে ধীরে বড়লোক হয়ে উঠলে তুমি, বদলাতে শুরু করলে। এখন তো তোমাকে মনে হয়, অনেক দূরের কোন মানুষ।'

'দেখো, মানুষ ধীরে ধীরে বদলাবেই। তখন আমি ছিলাম নেহাৎ একটা বালক। এতদিন পরেও কি আমাকে তখনকার মত থাকতে বলাটা ঠিক?'

'অর্থাৎ, তুমি টের পাচ্ছ যে অনেক বদলে গেছ তুমি,' বলল মেয়েটি। 'কিন্তু আমি আগের মত থাকাতেই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে আমাদের মধ্যে। তাছাড়া, আজ যে কথাগুলো তোমাকে বলছি, সেসব আমি একদিনে ভাবিনি। একটা কথাও আমি উত্তেজনার মাথায় বলছি না। যাই হোক, যদি চাও, খুশি মনে আমি তোমাকে মুক্তি দিতে পারি।'

'আমি কি কখনও মুক্তি চেয়েছি?'

'মুখ ফুটে অবশ্য কখনোই চাওনি।'

'তাহলে?'

'চেয়েছ পরিবর্তিত আচরণের ভেতর দিয়ে; পরিবর্তিত মনের মাধ্যমে। এক সময় আমিই ছিলাম তোমার আশা, তোমার ভরসা। এখনও কি তা-ই আছি? কিছু কিছু পার্থক্য আছে, যেগুলো একবার তৈরি হয়ে গেলে আর ঘোচানো যায় না। ঠিক তেমনি একটা পার্থক্যই তৈরি হয়েছে আমাদের মাঝে। সত্যি করে বলো তো, আবার কি তুমি আগের মত আমাকে জয় করবার চেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো? পারো না, স্ক্রুজ, পারো না!'

কথাগুলোর বাস্তবতা স্তম্ভিত করে দিল স্ক্রুজকে, কোন উত্তর জোগাল না তার মুখে। খানিক পর বিড়বিড় করে সে বলল, 'বুঝতে ভুল করছ তুমি।'

'না, ভুল আমি করিনি,' বলল মেয়েটি, 'বরং যা ভাবছি, তার উল্টোটা ভাবতে পারলেই আমার বরং ভাল লাগত অবশ্য আমি এটা বিশ্বাস করি যে, আমার কাছ থেকে মুক্তি পাবার পর তুমি হয়তো যৌতুক না নিয়েও কোন মেয়েকে বিয়ে করে বসতে পারো। যদি সত্যিই তাই করো, সেটা হবে তোমার মুহূর্তের ঝোঁকের ফল, তোমার স্বাভাবিক আচরণের বিরুদ্ধাচরণ। পরে সারাটা জীবন তোমার কাটবে অনুশোচনা করে। যাই হোক, আমি মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি তোমাকে, খুশি মনেই একসময় তুমি আমাকে সত্যিই ভালবাসতে—এই স্মৃতিই আমার জন্যে অনেক।'

কি যেন বলতে চাইল স্ক্রুজ, কিন্তু তার আগেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার কথা বলতে লাগল মেয়েটি।

'হয়তো কিছুদিন তুমি মনে রাখবে আমাদের ভালবাসার কথা, তারপর ভুলে

যাবে। দুঃস্বপ্ন ভেঙে জাগার পর যেমন খুশি হয় মানুষ, তেমনি খুশি হয়ে উঠবে। যাই হোক, যে জীবন নিয়ে তুমি সুখী হতে চাইছ, তাতে সত্যিসত্যিই সুখ খুঁজে পাও–এই কামনাই করি!'

চলে গেল মেয়েটি।

'ভূত!' বললেন স্ক্রুজ, 'যথেষ্ট হয়েছে, আর কিছু দেখানোর দরকার নেই। এবার বাড়ি চলুন। আমার ওপর অত্যাচার চালিয়ে কেন আনন্দ পেতে চাইছেন আপনি?'

'আর একটা দৃশ্য!' বলল ভূত।

'না!' চিৎকার করে উঠলেন স্ক্রুজ। 'আর একটাও নয়। আর কিছু দেখতে চাই না আমি।'

কিন্তু কোন কথা শুনল না ভূত, সবল বাহুর শক্ত বাঁধনে জড়িয়ে ধরল স্ক্রুজকে।

ধীরে ধীরে আবার বদলে গেল দৃশ্যপট। দেখা গেল একটা ঘর। খুব বড় নয় ঘরটা, খুব সুন্দরও নয়। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়, শান্তি যেন বাসা বেঁধে আছে এখানে। ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে আছে অত্যন্ত সুন্দরী একটি মেয়ে। একটু আগে স্ক্রুজের সাথে যে মেয়েটি কথা বলছিল, এ অনেকটা তারই মত দেখতে। তবে, এখন সে পুরোদস্তুর মহিলা, সামনেই বসে আছে তার মেয়ে। সারা ঘর ফেটে পড়ছে কোলাহলে। কারণ, আরও ছেলে-মেয়ে আছে ঘরে, যদিও মানসিকভাবে বিক্ষুব্ধ থাকায় স্ক্রুজ তাদের খেয়াল করেননি। ভীষণ চিৎকার করছে বাচ্চাগুলো। সেই যে কবিতায় আছে না–চল্লিশটা বাচ্চা আচরণ করছে একটা বাচ্চার মত–এরা ঠিক তার উল্টো। এদের একটা বাচ্চাই চেঁচাচ্ছে চল্লিশটা বাচ্চার সমান। অথচ এত চিৎকারেও বিরক্ত হচ্ছে না মা আর মেয়ে। হাসছে তারা দু'জনেই। দেখতে তারাও যোগ দিল বাচ্চাগুলোর সাথে। ধাক্কা দিয়ে দু'জনকেই মেঝেতে ফেলে দিল বাচ্চার দল, তারপর শুরু হলো অত্যাচার। কেউ চুল ধরে টানতে লাগল, কেউ চিমটি কাটল, কেউ বা আবার লাফাতে লাগল গায়ের ওপর চড়ে। আহা! আমি যদি ওই বাচ্চাগুলোর একজন হতাম!–ভাবলেন স্ক্রুজ। কিন্তু ওরকম অত্যাচার করা তো সম্ভব হত না আমার পক্ষে। উঁহুঁ, কিছুতেই পারতাম না আমি। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের বিনিময়েও সোনালি ওই চুলের গুচ্ছ ধরে আমি টানতাম না। তবে, অত্যাচার ছাড়াও আরও অনেক কিছু করছে বাচ্চারা, যেগুলো করতে ভালই লাগত আমার। ভাল লাগত ওকে চুমু খেতে, ভাল লাগত ওর দীর্ঘ ভ্রূর দিকে চেয়ে থাকতে, বেণী খুলে এলোমেলো করে দিতেও মন্দ লাগত না। মোট কথা, আমি ওর কাছে যেতে চাই শিশুর শরীরে পূর্ণবয়স্ক মানুষের মন নিয়ে।

একমনে কতক্ষণ ধরে এসব চিন্তা করছিলেন স্ক্রুজ, ঠিক বলতে পারবেন না। হঠাৎ চমকে উঠলেন। দরজায় টোকা দিচ্ছে কে যেন। শব্দটা কানে আসার সাথে সাথে খেলা ফেলে হুড়মুড় করে ছুটল বাচ্চার দল। দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলেন বাবা, তাঁর দু-হাত ভরা ক্রিসমাসের খেলনায়। বাচ্চারা সবাই একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবার ওপর। কেউ চেষ্টা করল হাত থেকে খেলনা কেড়ে নিতে, কেউ গলা ধরে ঝুলে পড়ল, কেউ ঘুসি মারতে লাগল পিঠে, আবার কেউ বা পায়ে লাথি

চালাতে লাগল ভালবাসার আতিশয্যে। এক ছেলে তো একটা খেলনা টার্কি ঢুকিয়ে দিল মুখের ভেতরে। বাবা-মা ছুটে গেল হাঁ হাঁ করে, আর ঠিক তখনই খিলখিল করে হেসে উঠল দুষ্টুটা। অবশেষে একসময় থামল তাদের কোলাহল। একে একে ওপরতলায় গিয়ে শুয়ে পড়ল সবাই।

স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে ফায়ারপ্লেসের ধারে গিয়ে বসলেন ভদ্রলোক। স্ক্রুজের মনে হলো, তাঁরও থাকতে পারত ওরকম একটি মেয়ে—জীবনের এই বিবর্ণ শীতকালে যে এনে দিতে পারত বসন্তের ছোঁয়া। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল তাঁর।

'বেলি,' স্ত্রীর দিকে ফিরে হাসিমুখে বললেন ভদ্রলোক, 'আজ বিকেলে তোমার এক পুরানো বন্ধুকে দেখলাম।'

'কে?'

'ভেবে বলো দেখি!'

'মনে করছ, পারব না?' হেসে উঠল মহিলা। 'মি. স্ক্রুজ।'

'ঠিক বলেছ। আজ তাঁর অফিসের পাশ দিয়ে আসছিলাম। একটা মোমবাতি জ্বেলে চুপচাপ বসেছিলেন তিনি। তাঁর পার্টনারটি মরণাপন্ন। বিরাট এই পৃথিবীতে বেচারি সত্যিই বড় একা।'

'ভূত!' ভাঙা গলায় বললেন স্ক্রুজ, 'আমাকে এখনই অন্য কোথাও নিয়ে চলুন।'

'কিন্তু এগুলো তো অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার ছায়ামাত্র,' বলল ভূত। 'একদিন যা ঘটে গিয়েছে, তা-ই দেখতে পাচ্ছ তুমি। এজন্যে অযথা আমাকে দোষ দিয়ো না!'

'অন্য কোথাও নিয়ে চলুন!' চেঁচিয়ে উঠলেন স্ক্রুজ। 'আমি আর পারছি না, পারছি না!'

ভূতটার দিকে তাকাতেই স্ক্রুজ দেখলেন, আজকের দেখা সবগুলো মানুষের ছায়া ভেসে উঠেছে তার মুখে।

'আমাকে ছেড়ে দিন! দয়া করে রেহাই দিন আমাকে!'

ভূতটার সাথে ধস্তাধস্তি করতে লাগলেন স্ক্রুজ। ভূতের কপালের আলোটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক পর্যায়ে টুপিটা কেড়ে নিয়ে ভূতটার মাথার ওপরে বসিয়ে দিলেন স্ক্রুজ।

সাথে সাথে টুপির ভেতরে ঢুকে পড়ল ভূতটা। প্রাণপণে টুপিটা মেঝের ওপরে ঠেসে ধরলেন স্ক্রুজ, কিন্তু আলোর বন্যা কিছুতেই রোধ করতে পারলেন না।

হঠাৎ নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হলো তাঁর, ঘুমে টলে উঠল সারা শরীর। সামনে তাকাতেই চোখে পড়ল বিছানা, তারপর আর কিছু মনে নেই।

তৃতীয় স্তবক

দ্বিতীয় ভূতের আগমন

হঠাৎ করেই ভেঙে গেল ঘুম। বিছানায় উঠে বসে স্ক্রুজ প্রথমটায় বুঝতে পারলেন না, একটা বেজেছে কি না। পরক্ষণেই ভাবলেন, নিশ্চয় বেজেছে, নইলে এত গাঢ় ঘুম হঠাৎ করে ভেঙে যেত না। মার্লের পাঠানো দ্বিতীয় ভূতটা আসবে এখন। ভীষণ ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে স্ক্রুজ ভাবলেন, আজকের ভূতটা আবার না জানি চাদরের কোন্‌দিক ধরে টান্ দেয়! কথাটা মনে হতেই চাদর গুটিয়ে রেখে আবার শুয়ে পড়লেন তিনি, তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগলেন বিছানার চারপাশে। আজকে সরাসরি ভূতটার মুখোমুখি হবেন তিনি, চমকে দেবার কোনরকম সুযোগ দেবেন না।

মোট কথা, সবরকম পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলেন স্ক্রুজ। শিশু কিংবা গণ্ডার–যে-রূপ ধরেই ভূতটা আসুক না কেন, ঘাবড়ে যেতে রাজি নন তিনি। ধীরে ধীরে কাটতে লাগল সময়। একসময় ঢং করে একটা বাজতে সামান্য চমকে উঠলেন স্ক্রুজ। তাঁর ধারণা ছিল, রাত একটা বেজে গেছে ঘুম থেকে ওঠার আগেই। অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি, কিন্তু কোন ভূত এল না। কেটে গেল পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, এমনকি পনেরো মিনিট, তবু এল না কেউ। স্ক্রুজ লক্ষ করেছেন, একটা বাজার সাথে সাথে লালাভ একটা আলো এসে পড়েছে তাঁর বিছানার ওপর, যদিও এর কোন অর্থ তিনি খুঁজে পাননি। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন ভূত এল না, বিষয়টা গোড়া থেকে ভাবতে লাগলেন স্ক্রুজ। একসময় তাঁর মনে হলো, আলোটা পাশের ঘর থেকে আসছে। দেখতে দেখতে ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে চেপে বসল তাঁর মনে। উঠে পড়লেন তিনি, চটি পায়ে এগিয়ে চললেন পাশের ঘরের দিকে।

তালায় হাত দিতেই অদ্ভুত গলায় কে যেন ডেকে উঠল তাঁর নাম ধরে, ভেতরে ঢুকতে বলল। ঢুকলেন স্ক্রুজ।

কোন সন্দেহ নেই, ঘরটা তাঁরই। কিন্তু অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে গেছে সেখানে। ছাদ আর দেয়াল থেকে ঝুলছে হলি, মিসল্‌টো আর আইভি। পাতাগুলোয় আলো প্রতিফলিত হবার ফলে মনে হচ্ছে, অসংখ্য খুদে আয়না যেন বসানো হয়েছে সারা ঘর জুড়ে। অদ্ভুতদর্শন এক চুলো থেকে বেরোচ্ছে আগুনের উজ্জ্বল শিখা। মেঝের ওপর স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে টার্কি, রাজহাঁস, মুরগি, লবণ দেয়া শুয়োরের মাংস, মায়ের দুধ-না-ছাড়া শুয়োর ছানা, মাংসের বড় বড় টুকরো, সসেজ, কিমার চপ, প্লাম-পুডিং, ঝিনুক, চেসনাট, লাল টকটকে আপেল, রসাল কমলা, মিষ্টি নাশপাতি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কেক আর বাটিভর্তি পাঞ্চ। স্তূপটার পাশেই বসে আছে বিশাল এক হাসিখুশি ভূত, হাতে মশাল। জ্বলন্ত মশালটা মাথার ওপরে উঁচু করে ধরায় তার আলো এসে পড়েছে স্ক্রুজের গায়ে।

'এসো!' প্রফুল্ল গলায় বলল ভূত। 'পরিচয়-পর্বটা সেরে ফেলা যাক!' আরে, এসো! সঙ্কোচের কিছু নেই।'

ভূতটার সামনে গিয়ে মাথা নিচু করে রইলেন স্ক্রুজ। এতক্ষণ ধরে সাহস বজায় রেখেছিলেন তিনি, ভূতটার আচরণেও ভয়ের কিছুই নেই, তবু কেন যেন চোখ তুলে তাকাতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

'আমার দিকে চেয়ে দেখো!' বলল ভূত। 'আমি বর্তমানকালের ক্রিসমাসের ভূত।'

সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে তাকালেন স্ক্রুজ। সাদা পশমের ঘের দেয়া সবুজ একটা রোব পরে আছে ভূতটা। অত্যন্ত শিথিলভাবে পরার ফলে বেরিয়ে আছে প্রশস্ত বুক। রোবের নিচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে খালি পা, মাথায় জড়ানো একটা হলির মালা। গাঢ় বাদামী কোঁকড়ানো চুলগুলো বেশ লম্বা; মুখটা অমায়িক। কোমরের কাছটায় ঝুলছে প্রাচীন একটা কোষ, যদিও তার ভেতরে তরবারি নেই। কোষটার সারা গায়ে মরচে ধরে গেছে।

'আমার মত ভূত নিশ্চয় আগে কখনও দেখোনি,' বলল ভূতটা।

'জীবনেও না,' বললেন স্ক্রুজ।

'আমাদের পরিবারের কমবয়েসী কারও সাথেও দেখা হয়নি কখনও?' জানতে চাইল ভূত।

'মনে হয় না,' বললেন স্ক্রুজ। 'কিছু মনে করবেন না, আপনার বুঝি অনেকগুলো ভাই?'

'আঠারোশোরও বেশি,' বলল ভূত।

'আপনাদের পরিবারটির প্রশংসা না করে পারছি না!' বিড়বিড় করে বললেন স্ক্রুজ।

উঠে দাঁড়াল ভূতটা।

'ভূত,' নরম গলায় বললেন স্ক্রুজ, 'যেখানে খুশি নিয়ে চলুন আমাকে। গত রাতে গিয়েছিলাম ইচ্ছের বিরুদ্ধে, কিন্তু শিখেছি অনেক কিছু। যদি আপনিও আমাকে কিছু শেখাতে এসে থাকেন, এমন কিছু শেখান, যাতে আমার উপকার হয়।'

'আমার রোব স্পর্শ করো!'

রোবের একটা প্রান্ত চেপে ধরলেন স্ক্রুজ।

হলি, মিসল্‌টো, আইভি, টার্কি, রাজহাঁস, মুরগি, শুয়োরের নোনা মাংস, শুয়োরছানা, সসেজ, চপ, পুডিং, পাঞ্চ–সব উধাও হয়ে গেল চোখের পলকে। উধাও হলো ঘর, চুলোর আগুন, লালাভ আলো, এমনকি রাত। দু'জনে এসে পৌঁছুল শহরের এক রাস্তায়। ক্রিসমাসের সকাল। বাড়ির সামনে থেকে বরফ পরিষ্কার করতে করতে বেসুরো গলায় গান গাইছে লোকেরা।

চারপাশে আর ছাদে বরফ থাকায় বেশ কালো মনে হচ্ছে বাড়িগুলোর সম্মুখভাগ। রাস্তায়ও জমে আছে পুরু বরফ, তার ওপরে দেখা যাচ্ছে গাড়ির চাকার দাগ। মোড়ের কাছে অসংখ্য চাকা অতিক্রম করেছে একে অপরকে। মুখ গোমড়া করে আছে আকাশ, ছোট ছোট গলিগুলোর শ্বাসরোধ করতে চাইছে মলিন

কুয়াশা। আপাতদৃষ্টিতে আনন্দের কোন চিহ্ন নেই শহরে কিংবা আবহাওয়ায়, তবু একটা প্রফুল্লভাব যেন ছড়িয়ে আছে চারপাশে। মনে হচ্ছে, আনন্দের বার্তা নিয়ে হয়তো সূর্য আসবে দূরদেশ থেকে, প্রকৃতিকে ভরিয়ে দেবে হাসির হিল্লোলে।

যারা বরফ সাফ করছে, আনন্দের অন্ত নেই তাদের। একজন আরেকজনকে বরফ ছুঁড়ে মারছে–কুৎসিত কথা ছুঁড়ে মারার চেয়ে এটা অবশ্য অনেক ভাল। বরফ ঠিকমত আঘাত হানলে হেসে লুটিয়ে পড়ছে তারা, এমনকি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও হাসির কমতি হচ্ছে না। মুরগির মাংসের কিছু কিছু দোকান খোলা আছে এখনও। ফলের দোকানগুলো সম্পূর্ণ খোলা। স্তূপ হয়ে আছে নাশপাতি আর আপেল। আঙুরগুলো এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, দেখলেই জিভে পানি আসে। পড়ে আছে কমলা আর লেবু, কাগজের ব্যাগে করে এগুলো নিয়ে যাওয়া হবে ডিনারের পর খাবার জন্যে। চারপাশে ছড়ানো এই ফলগুলোর মাঝখানে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সোনালি আর রূপালী মাছ।

মাত্র দুটো কি একটা করে শাটার খোলা আছে মুদি দোকানগুলোর। কিন্তু সেই ফাঁকটুকু দিয়েই দেখা যাচ্ছে হরেক রকম দৃশ্য। একপাশে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে কিশমিশ, বাদাম, দারুচিনি। বাক্সের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে ফরাসী প্লাম। নাকে ঝাপটা মারছে উৎকৃষ্ট চা আর কফির সুগন্ধ। জিনিস নেয়ার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে ক্রেতারা। এদিক সেদিক ছুটোছুটি করে টুকিটাকি নানান জিনিস কিনে তার অর্ধেকই হয়তো ফেলে রেখে যাচ্ছে কাউন্টারে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে আসছে হন্তদন্ত হয়ে। মুদি তার কর্মচারীদের নিয়ে হাসিমুখে সামাল দিচ্ছে সবকিছু।

একটু পরেই গির্জা থেকে ভেসে এল ঘণ্টাধ্বনি। দেখতে দেখতে মানুষের ঢল নামল রাস্তায়। যথাসাধ্য ভাল পোশাক পরেছে সবাই, সবার মুখ ভরে আছে খুশিতে। পরিচিত কারও সাথে দেখা হলে কুশল জিজ্ঞেস করছে তারা। ডিনার কেনার জন্যে যাচ্ছে বেকারিতে। ভূতটার ভাবসাবে মনে হলো, লোকগুলোকে দেখে খুব খুশি হয়েছে সে। স্ক্রুজকে সাথে নিয়ে সে গিয়ে দাঁড়াল বেকারির দরজায়। এককেকটা লোক বেরিয়ে এল ডিনার নিয়ে, আর হাতেধরা মশাল থেকে সেই ডিনারে সুগন্ধী ছড়িয়ে দিতে লাগল ভূতটা। আর এই সুগন্ধীর শক্তিও বড় অদ্ভুত। বেরোনোর সময় হয়তো একজনকে ঠেলে ফেলে আগে যেতে চাইছে কেউ, কিন্তু ভূতের সুগন্ধীর কয়েকটা ফোঁটা মাথায় পড়ার সাথে সাথে হেসে উঠছে দু'জনেই। পরস্পর ক্ষমা চেয়ে বলছে, আজকের দিনে ঝগড়া করা উচিত নয়। ঈশ্বর চান, আজ দ্বন্দ্ব-কোলাহল ভুলে সবাই খুশি হয়ে থাকুক।

একসময় বন্ধ হয়ে গেল বেকারি, কিন্তু রান্নার সুগন্ধ অনেকক্ষণ ভাসতে থাকল বাতাসে।

'যে-জিনিসটা আপনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন, তাতে অদ্ভুত একটা গন্ধ আছে, তাই না?' জানতে চাইলেন স্ক্রুজ।

'হ্যাঁ। আমার নিজের তৈরি গন্ধ।'

'আজকের যে-কোন ডিনারে থাকবে এই সুবাস?' আবার জানতে চাইলেন

স্ক্রুজ।

'হ্যাঁ, যদি সেই ডিনার বিতরণ করা হয় দয়ার্দ্র-হৃদয়ে। বিশেষ করে যদি সেটা দেয়া হয় দরিদ্রজনকে।'

'গরীবদের ব্যাপারে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন?'

'কারণ, খাবার তাদেরই সবচেয়ে বেশি দরকার।'

'ভূত, ভাবতে আমার খুব আশ্চর্য লাগছে যে, এই মানুষগুলোর নির্মল আনন্দের মাঝে আপনিই কিনা একটা মূর্তিমান বাধা!'

'আমি!' চেঁচিয়ে উঠল ভূত।

'আপনিই তো সাতদিনের ভেতর একদিন তাদের এই খাবারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখেন। বলতে গেলে সপ্তাহে মাত্র ওই একদিনই তো ওদের কোনরকমে খাবার জোটার সুযোগ থাকে।'

'আমি তাতে বাধা দিই কী করে?' আবার চেঁচিয়ে উঠল ভূত।

'আপনিই তো চান, যে-জায়গাগুলো থেকে ওদের খাবার বিতরণ করা হয়, সেগুলো সপ্তম দিনটিতে বন্ধ থাকুক।'

'আমি চাই?'

'কোন ভুল হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন,' বললেন স্ক্রুজ। 'কাজটা তো করা হয়ে থাকে আপনার নামে, অন্তত আপনাদের পরিবারের নামে।'

'হ্যাঁ, তোমাদের অনেকেই আমাদের সবকিছু জানে বলে দাবি করে বটে,' বলল ভূত, 'অথচ গর্ব, অশুভ কামনা, ঘৃণা, হিংসা, গোঁড়ামি, স্বার্থপরতা—এইসব নিয়ে মত্ত থাকো তোমরা। আমি কিংবা আমাদের বংশের কেউ এগুলোর নাম পর্যন্ত শোনেনি। সুতরাং যারা দোষী, তাদেরকেই অভিযুক্ত করো, আমাদের নয়।'

স্ক্রুজ হলফ করে বললেন যে, এমন ভুল আর কখনও হবে না। তারপর ভূতটার সাথে গিয়ে হাজির হলেন শহরতলিতে। স্ক্রুজ খেয়াল করেছেন, ভূতটার একটা বিরাট গুণ হলো, অতবড় শরীর সত্ত্বেও অনায়াসে যেখানে খুশি যেতে পারে। শহরতলিতে এসেও পাওয়া গেল সেই গুণের পরিচয়। ভূতটা গিয়ে দাঁড়াল অত্যন্ত নিচু ছাদঅলা একটা ঘরে।

গরীবদের প্রতি একটা বিশেষ টানের জন্যেই সম্ভবত ভূতটা এসে উপস্থিত হলো স্ক্রুজের কেরানির বাড়িতে। চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে হাসল সে, তারপর মশাল থেকে সুগন্ধী ছড়িয়ে শুভ কামনা করল বব ক্র্যাচিটের।

দেখা গেল মিসেস ক্র্যাচিটকে, পরনে সস্তা একটা গাউন। তার পেছনেই ক্র্যাচিটদের দ্বিতীয় মেয়ে—বেলিণ্ডা। এক কোণে বসে আলুর সসপ্যানে কাঁটাচামচ ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া করছে পিটার ক্র্যাচিট, সেইসাথে চিবুচ্ছে জামার কলার। জামাটা আসলে বব ক্র্যাচিটের, আজকের এই বিশেষ দিনটির খাতিরে সেটা সে পরতে দিয়েছে পুত্রকে। হঠাৎ ছুটে এসে ঘরে ঢুকল তাদের আরও দুই সন্তান। বেকারিতে রাজহাঁসের মাংসের গন্ধ পাওয়া গেছে—এই সংবাদটা দিয়েই খুশিতে নাচতে লাগল তারা। আর এই নাচ দেখে চুলোর আগুন আরও উসকে দিল পিটার। দু-এক মিনিটের মধ্যেই আলুগুলো ধাক্কা মারতে লাগল সসপ্যানের

ঢাকনিতে।

'তোমাদের মহামূল্যবান বাবাটি কি কখনোই যথাসময়ে আসবে না?' বলল মিসেস ক্র্যাচিট। 'আর টাইনি টিম? মার্থাই বা এত দেরি করছে কেন?'

'আমি এসে গেছি, মা!' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল একটি মেয়ে।

'এই তো এসে গেছে মার্থা!' একসাথে চেঁচিয়ে উঠল ছোট দুই ভাইবোন। 'জানো, বেকারিতে রাজহাঁস রান্না হচ্ছে!'

'এত দেরি করলি কেন?' মেয়েকে বারবার চুমু খেতে খেতে বলল মিসেস ক্র্যাচিট, দ্রুত হাতে খুলে ফেলল শাল আর বনেট।

'একটা কাজ শেষ করতে করতে রাত হয়ে গেল কাল,' বলল মার্থা, 'আজ সকালে আবার পরিষ্কার করতে হলো ঘরদোর।'

'যাকগে! আসতে যে পেরেছিস, এই ঢের,' বলল মিসেস ক্র্যাচিট। 'আয়, আগুনের পাশে এসে বোস।'

'না, না! বাবা আসছে,' আবার চেঁচিয়ে উঠল দুই ভাইবোন। 'লুকাও, মার্থা, লুকাও!'

তৎক্ষণাৎ লুকাল মার্থা। টাইনি টিমকে কাঁধে নিয়ে ঘরে ঢুকল বব ক্র্যাচিট। কী দুঃখের, টাইনি টিম ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে পারে না!

'আমার মার্থা মা কোথায়?' ঘরের চারদিকে একটা নজর বুলিয়ে জানতে চাইল বব ক্র্যাচিট।

'মার্থা আসবে না,' বলল মিসেস ক্র্যাচিট।

'আসবে না!' চেঁচিয়ে উঠলেন বব। 'আজকের দিনেও আসবে না!'

বাবার মুখে কষ্টের ছাপ ফুটে উঠতে দেখে আর লুকিয়ে থাকতে পারল না মার্থা। ক্লজিটের দরজার পেছন থেকে বেরিয়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরল সে।

'টাইনি টিম কেমন আছে?' জানতে চাইল মিসেস ক্র্যাচিট।

'ভাল, খুব ভাল,' বলল বব, 'ধীরে ধীরে আরও ভাল হয়ে উঠছে ও। একনাগাড়ে বসে থাকতে থাকতে চিন্তাশক্তিও অনেক বেড়েছে ওর। আমার সাথে বাড়ি আসতে আসতে ও কি বলছিল জানো? বলছিল, ওর পঙ্গুত্ব দেখে গির্জার সবাই সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবে ওর প্রতি। ওর আরোগ্যলাভের জন্যে প্রার্থনা করবে ঈশ্বরের কাছে। ক্রিসমাসের এই মহান দিনটিতে ঈশ্বর ভাল করে দেন পঙ্গুদের, দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন অন্ধের।'

সত্যিই ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠছে টিম—এই কথাটা আরেকবার বলার সময় গলা কেঁপে উঠল ববের।

আর ঠিক তখনই ভেসে এল টিমের ক্রাচের শব্দ, দুই ভাইবোনের সাথে সে বাথরুমে গিয়েছিল হাতমুখ ধুতে। ঘরে ঢুকে ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে পড়ল টিম, এগিয়ে গিয়ে ওর জামার হাতাদুটো গুটিয়ে দিল বব। দুই ভাইবোনসহ পিটার গেল বেকারিতে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই হৈ হৈ করতে করতে ফিরল তারা রাজহাঁস নিয়ে।

রাজহাঁস দেখার সাথে সাথে সবাই এমন তাড়াহুড়ো শুরু করে দিল, যেন এরকম পাখি পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। মাংসের ঝোল তৈরি করল মিসেস

ক্র্যাচিট; আলু ভর্তা করল পিটার; আপেলের সসে মিষ্টি মেশাল বেলিণ্ডা; থালাগুলো পরিষ্কার করল মার্থা। টাইনি টিমকে নিয়ে টেবিলের একপাশে বসে পড়ল বব, চারপাশ ঘিরে বসল আর সবাই। অবশেষে এক সময় সমস্ত ডিশ সাজিয়ে দেয়া হলো টেবিলে। প্রার্থনার পর একটা ছুরি হাতে নিল মিসেস ক্র্যাচিট, দম বন্ধ করে রইল বাচ্চারা। তারপর ছুরিটা রাজহাঁসের বুকে বসিয়ে দিতেই ঘর ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো তুমুল চিৎকারে। এমনকি টাইনি টিমও তার ছুরির হাতল দিয়ে বাড়ি দিতে লাগল টেবিলে, দুর্বল গলায় বলল—হুররে!

আপেলের সস আর আলুর ভর্তা সহযোগে রাজহাঁসের মাংস খেতে লাগল সবাই। বব বলল, খুব ভাল সস্তায় পাওয়া গেছে রাজহাঁসটা। শেষমেশ হাড়ের একটামাত্র ছোট টুকরো পড়ে রইল ডিশে, আর সেটা দেখিয়ে মিসেস ক্র্যাচিট বলল, রাজহাঁসটা এত বড় যে সবাই মিলে খেয়েও শেষ করা গেল না। অবশ্য পেট পুরে খেয়েছে সবাই। বিশেষ করে, ছোট দুই ভাইবোন তো খেয়েছে গলা পর্যন্ত! রাজহাঁসপর্ব সারা হতে থালাগুলো বদলে দিল বেলিণ্ডা, মিসেস ক্র্যাচিট গেল পুডিং আনতে।

রান্নাঘরের যত কাছাকাছি হলো, বুক ততই দুরুদুরু করতে লাগল তার। পুডিংটা যদি ঠিকমত তৈরি না হয়! যদি ভেঙে যায় উল্টোতে গিয়ে! বাড়ির পেছনদিকের দেয়াল টপকে যদি চুরি করে নিয়ে যায় কেউ! ভয়ঙ্কর যত চিন্তা, সব ভিড় করে এল তার মনে। যদি সত্যিই হারিয়ে যায় পুডিংটা, ছোট বাচ্চাদুটোর যা চেহারা হবে!

কিন্তু না! পুডিং খুব সুন্দর হয়েছে! ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে গেল মিসেস ক্র্যাচিটের। ফিরে এসে পুডিংটা টেবিলের ওপর রাখল মহিলা, মুখ ভরে আছে গর্বের হাসিতে। ভাপ উঠছে পুডিং থেকে, ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে হলির ছোট্ট একটা ডাল বসিয়ে দেয়া হয়েছে ওটার মাথায়।

পুডিংটা চমৎকার হয়েছে—বলল বব। সত্যি বলতে কি, তাদের বিয়ের পর এত ভাল পুডিং আর কখনোই হয়নি। এতক্ষণে মিসেস ক্র্যাচিট জানাল তার ভয়ের কথা। বলল, ময়দার পরিমাণ নিয়ে সত্যিই বড় চিন্তা ছিল। চুপ করে রইল সবাই। কেউ বলল না, এমন কি ভাবল না পর্যন্ত যে, বড় একটা পরিবারের পক্ষে পুডিংটা বড্ড ছোট।

অবশেষে একসময় চুকে গেল ডিনারের পাট। টেবিলক্লথ পরিষ্কার করা হলো, উসকে দেয়া হলো ফায়ারপ্লেসের আগুন। তারপর টেবিলে সাজানো হলো আপেল আর কমলা, প্রচুর পরিমাণে চেসনাট ফেলা হলো আগুনে। ফল খাওয়া শেষ হতে সবাই গিয়ে বসল ফায়ারপ্লেসের কাছে। বব যেখানটায় বসল, সেদিকে তাকাতেই দেখা গেল ক্র্যাচিট পরিবারের পানপাত্রের মজুত—দুটো টাম্বলার আর হাতলবিহীন একটা কাস্টার্ড-কাপ।

কিন্তু ওই তিনটে পাত্রে করেই সোনালি গবলেটে পান করা মানুষদের মত সুখী ভঙ্গিতে পান করল তারা। হাসিমুখে পানীয় বিতরণের কাজটা নিল বব, ওদিকে ফায়ারপ্লেসে ফুটফাট করে ফুটতে লাগল চেসনাট।

'মেরি ক্রিসমাস!' পরিবারের সবার উদ্দেশে বলল বব। 'ঈশ্বর আমাদের

শান্তি দিন!'

সবাই গলা মেলাল তার সাথে।

'ঈশ্বর আমাদের সবাইকে শান্তি দিন!' সবার শেষে বলে উঠল টাইনি টিম।

বাবার একেবারে পাশে বসে আছে সে। দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল রব, সম্পূর্ণ নতুন একটা ভালবাসা অনুভব করল ছেলেটার প্রতি। হঠাৎ করে ওর কিছু হয়ে যাবে না তো! অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল ববের।

'ভূত,' বললেন স্ক্রুজ, 'বলুন দেখি, টাইনি টিম বাঁচবে কিনা?' হঠাৎ এমন একটা কৌতূহল অনুভব করলেন তিনি, যেমনটা আর আগে কখনও করেননি।

'চিমনির পাশে একটা খালি আসন দেখতে পাচ্ছি,' বলল ভূত, 'একজোড়া ক্রাচ রাখা আছে যত্ন করে, কিন্তু আশপাশে কেউ নেই। যদি আমার দেখার কোন ভুল না হয়, তাহলে ছেলেটি বাঁচবে না।'

'না, না!' আঁতকে উঠলেন স্ক্রুজ। 'এত কঠিন হয়ো না! বলো, ও বাঁচবে!'

'যদি আমার দেখায় কোন ভুল হয়ে না থাকে, তাহলে আমাদের পরিবারের আর কেউ ছেলেটিকে দেখতে পাবে না। কিন্তু ওর বাঁচা কিংবা মরায় কী যায় আসে? তাছাড়া, যদি মরতে চায় তাহলে তো ওর মরাই উচিত, মরে অধিক জনসংখ্যা রোধে ভূমিকা রাখা উচিত।'

নিজের বলা কথা ভূতের মুখে শুনে মাথাটা ঝুঁকে পড়ল স্ক্রুজের, দুঃখ আর তীব্র অনুশোচনায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি।

'যদি সত্যিই নিজেকে মানুষ বলে মনে করো,' বলল ভূত, 'যদি সত্যিই মনুষ্যত্ব বলে কিছু থেকে থাকে তোমার, সহজেই বুঝতে পারবে, এসব চিন্তা করার কোন অধিকার তোমার নেই। কীভাবে তুমি বুঝবে যে, কার মরা উচিত আর কার বাঁচা উচিত? এমনও তো হতে পারে যে, তোমার চেয়ে কোন গরীব শিশুর বাঁচাটাই অনেক বেশি জরুরী। তাহলে কি সব মেনে নিয়ে খুশিমনে মরতে রাজি হবে তুমি?'

ভূতের বকুনি খেয়ে মাথা আরও ঝুলে পড়ল স্ক্রুজের। কিন্তু হঠাৎ নিজের নাম কানে যেতে চোখ তুলে চাইলেন তিনি।

'মি. স্ক্রুজ!' বলল বব; 'আমাদের এই ভোজ আমি আপনার নামেই উৎসর্গ করতে চাই।'

'হ্যাঁ, উৎসর্গ করার মত উপযুক্ত লোককেই তুমি খুঁজে বের করেছ বটে!' চিৎকার করে উঠল মিসেস ক্র্যাচিট, রাগে লাল হয়ে গেছে তার মুখ। 'লোকটাকে আমার সামনে এনে দাও না, কলজেটাই খেতে দিই! আমার কলজে খেতে সম্ভবত ভালই লাগবে তাঁর।'

'দেখো, আজ ক্রিসমাস, আজকের দিনটিতে ওভাবে চিন্তা না করলেই কি নয়?' বলল বব।

'আজ যে ক্রিসমাস, সে আমি খুব ভাল করেই জানি,' বলল মিসেস ক্র্যাচিট, 'কিন্তু তাই বলে কি মি. স্ক্রুজের মত একটা জঘন্য, কৃপণ, হৃদয়হীন লোকের স্বাস্থ্যপান করতে হবে? রবার্ট, তোমার চেয়ে হাড়ে হাড়ে তো ওকে আর কেউ চেনে না! অথচ তুমিই কিনা এই প্রস্তাব দিচ্ছ!'

'ডিয়ার,' নরম গলায় বলল বব, 'আজ ক্রিসমাস।'

'বেশ, তোমার আর এই দিনটির সম্মানে তাঁর স্বাস্থ্যপান করছি,' বলল মিসেস ক্র্যাচিট, 'মি. স্ক্রুজ দীর্ঘজীবী হোক! আ মেরি ক্রিসমাস অ্যাণ্ড আ হ্যাপী নিউ ইয়ার! তিনি যে খুব সুখী হবেন, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই!'

মায়ের দেখাদেখি পান করল ছেলেমেয়েরাও। এই প্রথম এখানে এমন একটা ব্যাপার ঘটল, যার মধ্যে প্রাণের কোন ছোঁয়া পাওয়া গেল না। টাইনি টিম পান করল সবার শেষে। এই পরিবারটির কাছে মি. স্ক্রুজ অনেকটা রাক্ষসের মত। তাই তাঁর নাম উচ্চারিত হতে অন্তত মিনিট পাঁচেক স্বাভাবিক আচরণ করতে পারল না ছেলেমেয়েরা।

তারপর আবার আগের মতই উৎফুল্ল হয়ে উঠল সবাই। বব বলল, পিটারকে একটা কাজে লাগাবার কথা ভাবছে সে, যেটা ঠিকঠাকমত করা গেলে সপ্তাহে অন্তত পক্ষে সাড়ে পাঁচ শিলিং করে পাওয়া যাবে। পিটার ব্যবসায়ী হবে ভেবে হাততালি দিয়ে উঠল ছোট দুই ভাইবোন। কিন্তু গম্ভীর হয়ে রইল পিটার। যদি সত্যিই অত আয় হয়, সেটাকে কোথায় খাটালে ভাল হবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে। এরপর মার্থা বলতে লাগল, মিলিনারিতে কি কি কাজ করতে হয় তার। কয়েক দিন আগে এক কাউন্টেস আর এক লর্ডকে দেখেছে, সে-কথাও বলতে ভুলল না। লর্ড লম্বায় পিটারের সমান—এ-কথা শোনার সাথে সাথে জামার কলার এত উঁচু করে দিল ছেলেটা যে তার মাথাই ঢেকে গেল প্রায়। কথার ফাঁকে ফাঁকে পানীয়ের জগটা ঘুরতে লাগল সবার হাতে হাতে। মার্থার কথা শেষে বরফের রাজ্যে একটা ছোট্ট ছেলের হারিয়ে যাওয়া নিয়ে একটা গান গেয়ে শোনাল টাইনি টিম।

বব ক্র্যাচিটের এই পরিবারটি অত্যন্ত সাধারণ। খুব ভাল একটা জামা কিংবা ওয়াটারপ্রুফ জুতোও নেই কারও। কিন্তু সেটা নিয়ে কারও কোন অভিযোগ নেই। বরং নিজেদের যেটুকু আছে, সেটুকু নিয়েই তারা সুখী। এতক্ষণের আনন্দ শেষে একে একে উঠতে লাগল সবাই। মশাল থেকে তাদের ওপর সুগন্ধী ছড়িয়ে দিতে লাগল ভূত, কিছু দেখতে না পেলেও হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল প্রত্যেকের মুখ। যতক্ষণ দেখা যায়, টাইনি টিমের দিকে তাকিয়ে রইলেন স্ক্রুজ।

আবার রাস্তায় এসে দাঁড়াল দু'জনে। ভীষণ তুষারপাতের ফলে ইতোমধ্যেই আঁধার নেমেছে চারপাশে। প্রতিটি বাড়ি থেকে ভেসে আসছে বাচ্চাদের চিৎকার। এক আত্মীয় যাচ্ছে আরেক আত্মীয়ের বাড়ি।

এরপর কোনরকম সংকেত না দিয়ে ভূতটা গিয়ে হাজির হলো নিরানন্দ এক মূরল্যাণ্ডে। চারপাশে ছড়ানো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর দেখলে মনে হয়, এটা যেন দৈত্যদের গোরস্থান। চারদিকে নজর বোলালেন স্ক্রুজ। শ্যাওলা, ফার্জ আর লম্বা লম্বা ঘাস ছাড়া আর কিছুই নেই। এইমাত্র অস্ত গেছে সূর্য, পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে আছে তার শেষ রক্তিম রশ্মিটুকু।

'এটা কোন জায়গা?' জানতে চাইলেন স্ক্রুজ।

'এখানে খনি-শ্রমিকেরা থাকে, এরা কাজ করে মাটির নিচে,' বলল ভূত। 'কিন্তু এদের সবাই আমাকে চেনে। ওই দেখো!'

আলো দেখা যাচ্ছে একটা কুঁড়েঘরের জানালায়। দু'জনেই এগিয়ে গেল সেদিকে। ভেতরে ছেলেপুলে, নাতি-নাতনী নিয়ে আগুনের পাশে বসে আছে এক বুড়ো আর এক বুড়ি। সবার পরনে ছুটির পোশাক। গুন্‌গুন্ করে ক্রিসমাসের গান গাইছে বুড়ো। গানটা খুব পুরানো, তার ছেলেবেলায় শেখা।

এখানে দেরি করল না ভূতটা। স্ক্রুজকে নিয়ে সে উড়ে চলল মূরল্যাণ্ডের ওপর দিয়ে। একটু পরেই কানে তালা লেগে গেল প্রচণ্ড শব্দে। সভয়ে নিচের দিকে তাকাতেই স্ক্রুজ দেখতে পেলেন সমুদ্র।

তীর থেকে প্রায় এক লীগ দূরে নিঃসঙ্গ একটা লাইটহাউস। আগাছা স্তূপীকৃত হয়ে আছে লাইটহাউসটার গোড়ায়, আশেপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে সামুদ্রিক পাখি।

লাইটহাউসের ভেতরে একটা টেবিলের দু-পাশে বসে আছে দু'জন লোক, সস্তা মদ খেতে খেতে 'মেরি ক্রিসমাস' জানাচ্ছে একে অপরকে।

এখানেও বেশি দেরি করল না ভূতটা। সাঁ সাঁ করে উড়ে চলল কালো জলরাশির ওপর দিয়ে। কিছুক্ষণ পর তারা গিয়ে দাঁড়াল একটা জাহাজের চালকের পাশে। জাহাজের সমস্ত কর্মচারী নিজের নিজের দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকেই তারা গাইছে ক্রিসমাসের গান, কেউ বা গলা নামিয়ে তার সহকর্মীকে শোনাচ্ছে বিগত দিনের কোন ক্রিসমাসের গল্প। দূরের আত্মীয়স্বজনদের কথা স্মরণ করছে তারা। ভাবছে, আজকের দিনে আত্মীয়স্বজনেরাও নিশ্চয় স্মরণ করছে তাদের।

ঢেউয়ের শব্দ শুনতে শুনতে স্ক্রুজ ভাবছিলেন আজকের উড়ে আসার কথা, হঠাৎ প্রাণখোলা হাসির শব্দে চমকে উঠলেন তিনি। আরও চমকালেন, যখন খেয়াল করলেন যে হাসিটা তাঁর ভাগনের। চোখ তুলে তাকাতেই নিজেকে তিনি আবিষ্কার করলেন আলোয় পরিপূর্ণ একটা ঘরে, পাশেই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে ভূতটা।

'হা হা!' হাসছে স্ক্রুজের ভাগনে। 'হা হা হা!'

পৃথিবীতে খুব কম লোকই বুঝি এভাবে হাসতে পারে। হাসির দমকে সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। তার স্ত্রী-ও হাসছে তার সাথে সাথে। ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে তাদের যেসব বন্ধুবান্ধব একত্রিত হয়েছে, কম যাচ্ছে না তারাও।

'হা হা! হা হা হা হা!'

'তাঁর মতে ক্রিসমাস একটা বাজে ব্যাপার,' বলল স্ক্রুজের ভাগনে। 'কথাটা তিনি শুধু বলেন না, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন! হা হা হা!'

'ছি ছি, কি লজ্জার কথা!' বলল ভাগনে-বৌ।

মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী। ছোট্ট মুখমণ্ডলে ছোট্ট মুখটি দেখলে মনে হয়, ঈশ্বর যেন এটা সৃষ্টি করেছেন চুমু খাবার জন্যে। খুদে খুদে কয়েকটা তিল আছে চিবুকে, হাসলে সেগুলো যেন একটার সাথে আরেকটা একাকার হয়ে যায়, টোল পড়ে গালে। ঝকমক করছে চোখজোড়া। সব মিলিয়ে তার সৌন্দর্য যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে।

'আসল কথা হচ্ছে,' বলল স্ক্রুজের ভাগনে, 'ভারী হাস্যকর বুড়োটা।'

'তিনি নিশ্চয় খুব ধনী,' বলল ভাগনে-বৌ। 'অন্তত তুমি আমাকে এতদিন

ধরে সে-কথাই বলে এসেছ।'

'তিনি ধনী হলেই বা কি, না হলেই বা কি!' বলল স্ক্রুজের ভাগনে। 'ওই টাকা তো তাঁর কোনও কাজে আসবে না। ওই টাকা দিয়ে কোনও ভাল কাজ করতে উনি রাজি নন।'

'ওঁকে মনে হয় এক মুহূর্তও সইতে পারব না আমি,' বলল ভাগনে-বৌ। তার বোনগুলো এবং অন্য মেয়েরাও ব্যক্ত করল একই মত।

'আমি পারব!' বলল ভাগনে। 'আসলে তাঁর জন্যে আমার দুঃখ হয়; আমি ইচ্ছে করলেও তাঁর ওপর রাগ করতে পারব না। ঝোঁকের মাথায় কাজ করেন উনি, আর সেজন্যে শাস্তিও পান যথেষ্ট। এই যে আমি নিজে গিয়ে বারবার বলা সত্ত্বেও উনি আসলেন না, এতে ক্ষতি হলো কার? চমৎকার একটা ডিনার থেকে বঞ্চিত হলেন নিজেই।'

'হ্যাঁ, ডিনারটা সত্যিই চমৎকার ছিল,' বলল ভাগনে-বৌ। এবারেও সবাই একমত হলো তার সাথে।

'শুনে সুখী হলাম যে,' বলল ভাগনে, 'রান্নাটা ভাল হয়েছিল। আমার আবার কমবয়েসী হাউসকীপারদের ওপর খুব একটা ভরসা নেই। তুমি কি বলো, টপার?'

টপারের অবশ্য তখন ঠিক জবাব দেয়ার মত অবস্থা নয়, গভীর মনোযোগের সাথে সে লক্ষ করছে ভাগনের এক শ্যালিকাকে। কোনমতে শুধু বলল যে, পৃথিবীতে অবিবাহিতদের চেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত আর কেউ নেই, সুতরাং এই ধরনের প্রশ্নের জবাব দেয়া তাদের সাজে না। টপারের কথা শুনে চোখমুখ লাল হয়ে গেল ভাগনের গোলগাল শ্যালিকাটির।

'ওর কথা বাদ দাও,' বলল ভাগনে-বৌ। 'কোন কথাই ও ঠিকমত শেষ করে না—আজব লোক! তার চেয়ে তুমি কি বলছিলে বলো।'

স্ক্রুজের ভাগনে আবার ফেটে পড়ল হাসিতে। এরকম হাসি বড় সংক্রামক, যোগ না দিয়ে পারা যায় না। তবু অতিকষ্টে নিজেকে সামলে গম্ভীর হয়ে রইল শ্যালিকা, আর তাই দেখে অন্যেরাও সামলে নিল নিজেদের।

'আমি বলতে চাইছিলাম,' বলল ভাগনে, 'আমাদের এখানে এলে তো মামার কোন ক্ষতি হত না, বরং সুন্দর কিছু সময় কাটত তাঁর। আমাদের প্রতি বেশ একটা বিতৃষ্ণা আছে তাঁর, কিন্তু অনেক ভেবেও তার কোন কারণ খুঁজে পাইনি। তবে আসুন আর না-ই আসুন, আসতে আমি বলবই। প্রতি বছর বলব। কারণ, তাঁকে দেখলে কেন যেন করুণা হয় আমার। তাছাড়া, আমার এখানে না এলেও প্রতি বছর ক্রিসমাসের মাহাত্ম্য শুনতে শুনতে তিনি যদি কিছুটা শুধরে যান, তাহলে মন্দ হয় না। গতকাল আমি যে কথাগুলো বলেছি, তাতে মনে হয় মোটামুটি নাড়া খেয়েছেন উনি।'

স্ক্রুজকে নাড়া দেয়ার কথা শুনে হাসিতে ফেটে পড়ল অতিথিরা। কিন্তু ভাগনেটি সত্যিই খুব ভাল মানুষ। এই হাসিতে একটুও অপমানিত বোধ করল না, বরং সে-ও যোগ দিল সবার সাথে।

এরপর শুরু হলো গান। সবাই, বিশেষ করে টপার বেশ ভাল গায়। সুরের দুরূহতম জায়গায় গিয়েও কপালের শিরা ফুলে ওঠে না তার। ভাগনে-বৌয়ের

বীণার হাতটিও বেশ মিষ্টি। গান শুনতে শুনতে স্ক্রুজের আবার মনে পড়ে গেল শৈশবের কথা। ভাবলেন, আহা, এরকম গান শোনার অভ্যেস যদি আগে থেকে করতেন, হয়তো শোধরাতে পারতেন নিজেকে!

গানের পরে শুরু হলো খেলা। কানামাছি। পূর্ণবয়স্ক মানুষদের অবশ্য কানামাছি খেলা মানায় না, কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষেরই কখনও না কখনও শিশু হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। আর, কে না জানে, শিশু সাজার জন্যে ক্রিসমাসের চেয়ে চমৎকার দিন আর হতে পারে না। চোখ বেঁধে দেয়া হলো টপারের। কিন্তু মনে হলো, পায়েও একজোড়া চোখ আছে তার। কারণ, একটা করে পা ফেলছে সে, আর প্রায় সাথে সাথে নির্ভুলভাবে জেনে যাচ্ছে সবার অবস্থান। তবে কারও পিছু না নিয়ে সব সময় ছুটে যাচ্ছে সে গোলগাল শ্যালিকাটির দিকে। মাঝেমধ্যে ধাক্কা লাগছে এর-ওর সাথে, কিন্তু তাদের সরিয়ে দিয়ে সে ছুটে যাচ্ছে আবার। শ্যালিকাটি প্রায়ই বলছে যে, এভাবে শুধুই তার পিছু নেয়াটা ভারী দৃষ্টিকটু। কিন্তু কে শোনে কার কথা! একসময় টপার সত্যিই ধরে ফেলল মেয়েটিকে, জোর করে টেনে নিয়ে গেল ঘরের এক কোণে। এমন ভাব করতে লাগল, যেন মেয়েটিকে সে জীবনে কখনও দেখেনি, যেন তার সাথে কথা বলার চেয়ে তার আংটি আর মালা ছুঁয়ে দেখাটাই অনেক বেশি জরুরী। এই আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে মেয়েটি তাকে বকুনি দিল জঘন্য লোক বলে।

ভাগনে-বৌ কিন্তু যোগ দেয়নি কানামাছিতে, বড় একটা চেয়ার নিয়ে এক কোণে বসে খেলা দেখছে সে। তার একেবারে পাশেই স্ক্রুজকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভূতটা। কানামাছি শেষ হতে শুরু হলো ফরফিট্স্, আর হৈ হৈ করে এই খেলাটিতে যোগ দিল ভাগনে-বৌ চিৎকার করতে লাগলেন স্ক্রুজ, তিনিও যোগ দিতে চান খেলায়। সাবধান করে দিয়ে ভূত বলল, গলা ফাটালেও তার চিৎকার শুনতে পাবে না কেউ। স্ক্রুজ তখন অনুরোধ করলেন অতিথিরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত এখানে থেকে যেতে। ভূত জানাল, সেটা সম্ভব নয়। স্ক্রুজের কথায় রাজি না হলেও তাঁর এই শিশুসুলভ আচরণ দেখে মনে মনে খুব খুশি হলো ভূতটা।

'এটা একটা নতুন খেলা,' বললেন স্ক্রুজ, 'আর আধ ঘণ্টা থাকুন এখানে, মাত্র আধ ঘণ্টা!'

খেলাটা এরকম, একটা জিনিসের আভাস দেবে ভাগনে, বলতে হবে, জিনিসটা কী। অনেক ভেবেচিন্তে একটা জিনিসের আভাস দিতে লাগল সে, কিন্তু সহজেই সেটার নাম বলে ফেলল অতিথিরা।

শেষমেশ অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে সে বলল, 'এবার আমি ভাবছি একটা জন্তুর কথা। জন্তুটা হিংস্র, দেখতে বিশ্রী। মাঝেমাঝে গর্জন করে, ঘোঁৎঘোঁৎ করতেও ছাড়ে না। জন্তুটার বাস লণ্ডনে, কিন্তু চিড়িয়াখানায় নয়। সদর রাস্তা ধরে হেঁটে যায় জন্তুটা, কিন্তু সাথে কেউ থাকে না, এমনকি ওটাকে নিয়ে খেলাও দেখায় না কেউ। তোমাদের সুবিধের জন্যে বলে দিচ্ছি, এটা ঘোড়া, গাধা, গোরু, বলদ, বাঘ, কুকুর, শুয়োর, বিড়াল, কিংবা ভালুক নয়। এবার বলো দেখি, এটা কোন্ জন্তু?'

একের পর এক জবাব দিতে লাগল সবাই, কিন্তু কারও জবাব সঠিক হলো না। একেকটা ভুল জবাবের সাথে সাথে হাসির মাত্রা বেড়ে গেল ভাগনের। হাসির দমকে এক পর্যায়ে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল সে, পা ঠুকতে লাগল মেঝেতে। দেখা-দেখি হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েছিল শ্যালিকাও, হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সে:

'আমি বুঝতে পেরেছি! বুঝতে পেরেছি, ফ্রেড! এই মুহূর্তে আমি বলতে পারি জন্তুটার নাম!'

'বলো দেখি?' চেঁচিয়ে উঠল ফ্রেড।

'তোমার মামা—স্ক্রু-উ-উ-উ-জ!'

আবার হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল ফ্রেড। ঘাড় নেড়ে জানাল, জবাব সঠিক হয়েছে।

'বুড়ো মানুষটি যে আজ আমাদের অনেক আনন্দ দিয়েছেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই,' বলল ফ্রেড, 'সুতরাং এর পরে তাঁর স্বাস্থ্যপান না করাটা অন্যায় হবে। এই যে, এখান থেকে ওয়াইন নাও সবাই। বলো, স্ক্রুজ মামা দীর্ঘজীবী হোক!'

'স্ক্রুজ মামা দীর্ঘজীবী হোক!' সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

'ক্রিসমাস আর নববর্ষের শুভেচ্ছা বুড়োকে, যেমনই হোক না কেন সে,' বলল ভাগনে।

ভাগনের কথা শুনে স্ক্রুজের মনটা আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠল। আরেকটু সময় পেলে তিনি হয়তো ধন্যবাদ জানাতেন এখানকার সবাইকে, কিন্তু সে সুযোগ আর তাঁকে দিল না ভূতটা। ফ্রেডের কথা শেষ হবার সাথে সাথে উধাও হয়ে গেল পুরো বাড়িটা।

স্ক্রুজকে নিয়ে আবার এগিয়ে চলল ভূত। অনেক জায়গায় গেল তারা, দেখল অনেক মানুষ। তবে যে-দৃশ্যই দেখল, প্রত্যেকটাই শেষ হলো আনন্দের মধ্যে দিয়ে। রোগীর বিছানার পাশে গেল তারা, গেল জেলখানায়, হাসপাতালে, গরীব মানুষের বাড়ি—শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে খুশির একটা আমেজ।

রাতটা অত্যন্ত দীর্ঘ মনে হলো। স্ক্রুজ বুঝতে পারলেন না, ভূতেদের আগমন ভিন্ন ভিন্ন রাতে হলেও আসলে এসব ঘটনা একরাতেই ঘটছে কিনা। অদ্ভুত একটা ব্যাপার চোখে পড়েছে তাঁর। ভূতের সাথে ঘুরে বেড়ানোর এই সময়টুকুর মধ্যে তাঁর নিজের কোন পরিবর্তন না হলেও ভূতটার বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে। পরিবর্তনটা লক্ষ করলেও কোন উচ্চবাচ্য অবশ্য তিনি করলেন না। কিন্তু এক টুয়েলফথ নাইট পার্টি থেকে ফিরে যখন দেখলেন, ভূতটার চুল পেকে গেছে, আর চুপ করে থাকতে পারলেন না স্ক্রুজ।

'ভূতদের আয়ু কি খুব কম?' জানতে চাইলেন তিনি।

'পৃথিবীতে আজই আমার শেষ রাত,' জবাব দিল ভূত।

'আজই!' আর্তনাদ বেরিয়ে এল স্ক্রুজের গলা চিরে।

'হ্যাঁ, মাঝরাতে। ওই শোনো! আর দেরি নেই।'

আশেপাশেই কোথায় যেন বেজে উঠল ঘড়ি। পৌনে বারোটা।

'কিছু মনে করবেন না, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই,' ভূতটার রোবের দিকে তাকিয়ে বললেন স্ক্রুজ, 'আপনার পোশাকের ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত জিনিস বেরিয়ে আসছে, কিন্তু জিনিসটা আপনার নয়। ওটা কি পা নাকি থাবা?'

'জিনিসটার গায়ে যেহেতু মাংস আছে, এটা থাবাও হতে পারে,' দুঃখী গলায় বলল ভূতটা। 'এই দেখো।'

রোবের ভেতর থেকে দুটো শিশু বের করল সে। কুৎসিত তাদের চেহারা। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল দু'জনেই, আঁকড়ে ধরল রোবের একটা প্রান্ত।

'দেখো, মানুষ! তাকাও এদের দিকে। দেখো! দেখো!' চেঁচিয়ে উঠল ভূতটা।

একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। পাণ্ডুর কৃশ শরীর, বিকৃত চোখেমুখে নেকড়ের বন্যতা। মুখ এমনই শুকনো, যেন কতদিন ধরে কিছু খায়নি ওরা। এখন তাদের যে বয়স, তাতে দিনে দিনে ফুলের মত বিকশিত হয়ে ওঠার কথা। অথচ ইতোমধ্যেই তাদের চেহারায় পড়েছে প্রচুর বয়সের ছাপ, বিশ্রীভাবে কুঁচকে গেছে চামড়া। যেখানে ফুটে ওঠার কথা দেবদূতের হাসি, সেখানে যেন ভ্রূকুটি হানছে দানব। সত্যি বলতে কি, দানবও এদের তুলনায় অনেক সুন্দর।

প্রচণ্ড আতঙ্কে দুই-পা পিছিয়ে গেলেন স্ক্রুজ। প্রাণপণ চেষ্টা করে বলতে চাইলেন, শিশুদুটো সুন্দর–কথা আটকে গেল গলার মধ্যে। জীবনে অনেক মিথ্যে বলেছেন স্ক্রুজ, তবু এত বড় মিথ্যে কথা তিনি বলতে পারলেন না।

'ভূত! বাচ্চা দুটো কি আপনার?' শেষমেশ এটুকুই তিনি বলতে পারলেন কোনমতে।

'না। এরা মানুষের,' শিশুদুটোর দিকে চেয়ে জবাব দিল ভূত। 'এই বালক হলো অজ্ঞতা। আর মেয়েটি–অভাব। এদের, বিশেষ করে এই বালকটির থেকে সাবধান। এর কপালের ওপর লেখা আছে মানবজাতির ধ্বংসের ইতিহাস!'

'ওদের কোন আশ্রম নেই, কিংবা সাহায্য করার মত কোন সংস্থা?' চিৎকার করে উঠলেন স্ক্রুজ।

'দেশের জেলখানাগুলো কি সব উঠে গেছে? নাকি বন্ধ হয়ে গেছে ইউনিয়ন ওয়র্কহাউসগুলো?' নিজের বলা কথা আবার ভূতের মুখে শুনতে পেলেন তিনি।

ঢংঢং করে বাজল বারোটা।

চারপাশে তাকালেন স্ক্রুজ, কিন্তু ভূতটাকে আর দেখতে পেলেন না। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত তাঁর মনে পড়ে গেল জ্যাকব মার্লের কথা। এবার তৃতীয় ভূতটার আসার সময় হয়েছে। হ্যাঁ, ওই তো নিঃশব্দচরণে এগিয়ে আসছে সে।

চতুর্থ স্তবক

তৃতীয় ভূতের আগমন

ধীরে ধীরে, রাশভারী চালে এগিয়ে এল ভূতটা। একেবারে কাছে আসতে, হাঁটু ভেঙে বসে পড়লেন স্ক্রুজ। তাঁর মনে হলো, ভূতটা উপস্থিত হবার সাথে সাথে বিষণ্ণ, রহস্যময় একটা আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে।

নিকষ কালো পোশাক ওটার সর্বাঙ্গে জড়ানো। শুধু প্রসারিত একটা হাত ছাড়া মাথা, মুখ, কিংবা শরীরের কোন অংশই আর চোখে পড়ছে না। কালো পোশাকটার কারণে চারপাশের আঁধার থেকে তাকে আলাদা করা যাচ্ছে না, যেন অন্ধকারে মিশে আছে গাঢ়তর অন্ধকার।

ভূতটা বেশ লম্বা, হাঁটার মধ্যে একটা মর্যাদাপূর্ণ ভাব আছে। কোন কথা বলল না সে, নড়ল না একচুল। আতঙ্কিত করার মত কোন আচরণই সে করল না, তবু ভীষণ একটা আতঙ্ক খামচে ধরল স্ক্রুজের হৃৎপিণ্ড।

'আপনি কি অনাগত ক্রিসমাসের ভূত?' কাঁপতে কাঁপতে বললেন তিনি।

কোন জবাব দিল না ভূতটা, শুধু হাতটা বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে।

'আপনি আমাকে এমন সব জিনিস দেখাতে চান, যেগুলো এখনও ঘটেনি, কিন্তু আগামী দিনগুলোতে ঘটবে,' বললেন স্ক্রুজ। 'তাই না ভূত?'

এবারও কোন জবাব দিল না ভূতটা। তবে, দ্রুত একবার ভাঁজ হয়ে গেল পোশাকের ওপরের দিকটা, মনে হলো যেন মাথা ঝাঁকাল সে।

পরপর তিন তিনটে ভূত দেখে ভূতের সঙ্গ অনেকটা সয়ে এসেছিল স্ক্রুজের, তবু কেন যেন ভীষণ ভয় পেলেন এই ভূতটাকে দেখে। ভূতের সাথে যেতে হবে ভেবে ইতোমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল হাঁটু দুটো। তাঁর অবস্থা বুঝতে পেরেই যেন দাঁড়িয়ে রইল ভূতটা, তাঁকে সামলে নেয়ার সুযোগ দিল।

কিন্তু ভয় তাঁর একটুও কমল না। মুখ দেখতে না পেলেও মনে হলো, পোশাকের ভেতর থেকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে রয়েছে ভূতটা। হাতটা বেরিয়ে না থাকলে ওটাকে কালো একটা স্তূপ ছাড়া আর কিছুই মনে হত না, আসলে এই দেখতে না পাওয়াটাই হলো আতঙ্কের কারণ। পৃথিবীতে যে জিনিস যত অজানা, সেটাই তত বেশি ভয়ঙ্কর।

'অনাগতকালের ভূত!' বললেন তিনি, 'আপনার আগে আরও তিনটে ভূতের সাথে দেখা হয়েছে আমার, কিন্তু আপনার মত ভয় আর কাউকে দেখে লাগেনি। তবে ভয় পেলেও আপনার সাথে যে-কোন জায়গায় যেতে রাজি আছি আমি। কারণ, আমি জানি, আপনি এসেছেন আমাকে শোধরাতে। কিন্তু আপনি কি এরকম চুপ করেই থাকবেন, কিছু বলবেন না?'

কোন জবাব দিল না ভূতটা। হাতটা স্থির হয়ে রইল সামনের দিকে।

'পথ দেখান!' বললেন স্ক্রুজ। 'চলুন! দ্রুত কেটে যাচ্ছে রাত। আমি জানি, সময় আমার কাছে কতটা মূল্যবান। চলুন, আর দেরি করবেন না!'

সামান্য নড়ে উঠল ভূতটা। স্ক্রুজের মনে হলো, যেন ওটা এগিয়ে এল তাঁর দিকে। একমুহূর্ত দেরি না করে তিনি অনুসরণ করলেন ভূতটাকে।

চোখের পলকে বদলে গেল দৃশ্যপট, একটা শহর দেখতে পেলেন তিনি। তবে, এবারে দৃশ্যপট বদলে যাবার ঘটনাটা ঘটল একটু অদ্ভুতভাবে। স্ক্রুজের মনে হলো, তাঁরা শহরটার দিকে গেলেন না, বরং শহরটাই যেন ছুটে এল তাঁদের কাছে। এটা শহরের প্রাণকেন্দ্র; দলে দলে ব্যবসায়ী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখেমুখে ফুটে বেরচ্ছে অতিব্যস্ততার চিহ্ন। নিজেদের মধ্যে কী যেন আলোচনা করছে তারা, ঘড়ি দেখছে ঘন ঘন। আর যারা ছুটোছুটি করছে, পয়সার ঠুংঠাং শব্দ ভেসে আসছে তাদের পকেট থেকে।

ব্যবসায়ীদের একটা দলের ওপর ঝুঁকে পড়ল ভূতটা। একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন স্ক্রুজ, হঠাৎ ভূতটাকে হাত প্রসারিত করতে দেখে ছুটে গেলেন দলটার কাছে।

'না,' বলল বিরাট চিবুকঅলা অত্যন্ত মোটাসোটা একটা লোক, 'এ-ব্যাপারে বিস্তারিত কিছুই বলতে পারব না। শুধু এটুকু জানি যে সে মারা গেছে।'

'কখন মারা গেল?' জানতে চাইল একজন।

'খুব সম্ভব, কাল রাতে।'

'কেন মারা গেল, কী হয়েছিল ওর?' বেশ বড় সড় একটা নস্যির কৌটো থেকে নস্যি নিয়ে জানতে চাইল আরেকজন। 'আমি তো ভেবেছিলাম, ও মরবেই না।'

'ঈশ্বর জানে,' বলল প্রথমজন।

'টাকাগুলো শেষ পর্যন্ত কী করল?' বলল লাল-মুখো এক লোক। নাকের শেষ প্রান্তে একটা আঁচিল আছে লোকটার, কথা বলার সাথে সাথে দুলে উঠছে টার্কি-মোরগের ফুলের মত।

'জানি না,' হাই তুলল মোটা লোকটা। 'তার কোম্পানির নামেই জমা আছে বোধ হয়। একটা ব্যাপারে তোমাকে নিশ্চিত করতে পারি যে, টাকাগুলো সে আমাকে দিয়ে যায়নি।'

হেসে উঠল সবাই।

'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটা নিশ্চয় কোনরকমে পার করা হবে,' আবার বলল মোটা লোকটা; 'মেলামেশা তো কারও সাথেই ছিল না, অনুষ্ঠানে যাবেই বা কে! আচ্ছা, আমরা গেলে কেমন হয়?'

'আমি যাব, যদি লাঞ্চ দেয়,' বলল আঁচিলঅলা লোকটা। 'যদি খাটাখাটুনি করতে হয়, তাতেও রাজি আছি, কিন্তু খেতে দিতেই হবে।'

আবার হেসে উঠল সবাই।

'প্রস্তাব দিলেও যাবার ব্যাপারে আমার ইচ্ছেই অবশ্য সবচেয়ে কম,' বলল মোটা, 'কারণ, জীবনে আমি কখনও কালো দস্তানা পরিনি, আর লাঞ্চ খাওয়া তো কবেই বাদ দিয়েছি। তবে, তোমরা সবাই যদি যেতে চাও, তাহলে কি আর করা!

তাছাড়া, মৃত্যুসংবাদটা পাবার পর থেকে একটা কথা মনে হচ্ছে আমার। সারা শহরের মধ্যে আমিই বোধ হয় ওর একমাত্র বন্ধু ছিলাম। যখন যেখানেই দেখা হয়েছে, থেমে কথা বলেছি আমরা। বাই, বাই!'

হাসতে হাসতে ভেঙে গেল দলটা। তবে সবাই বাড়ি চলে গেল না, কেউ কেউ গিয়ে যোগ দিল অন্য দলের সাথে। দলের প্রত্যেকটা লোককেই চিনতে পেরেছেন স্ক্রুজ। কিন্তু ভূত এদের কথা শুনতে বলল কেন, তা বুঝতে পারেননি। ব্যাখ্যার জন্যে ভূতটার দিকে মুখ তুলে চাইলেন তিনি।

কিন্তু কোন ব্যাখ্যা দিল না ভূত। অবলীলাক্রমে গা ভাসিয়ে চলে গেল আরেক রাস্তায়, অঙ্গুলি নির্দেশ করল দুজন লোকের দিকে। সাথে সাথে ছুটে গিয়ে কান পাতলেন স্ক্রুজ, ভাবলেন, এদের কথা শুনলে পাওয়া যেতে পারে ব্যাখ্যাটা।

দু'জনকেই তিনি ভালভাবে চেনেন। দু'জনেই নামকরা ব্যবসায়ী, অত্যন্ত ধনী, শহরের প্রায় সবাই এদের তোয়াজ করে চলে। তিনিও। ভাল ব্যবসায়ী হতে হলে মনের বিরুদ্ধে কত কি যে করতে হয়!

'কেমন আছ?' বলল একজন।

'কেমন আছ?' জবাব দিল আরেকজন।

'ভাল!' বলল প্রথমজন। 'বুড়ো তাহলে মরল শেষ পর্যন্ত, কি বলো?'

'তাই তো শুনলাম,' বলল দ্বিতীয়জন। 'খুব ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না?'

'ক্রিসমাসের সময় প্রত্যেক বছরই এরকম ঠাণ্ডা পড়ে। স্কেটিং করার অভ্যেস নেই নিশ্চয়?'

'না। না। স্কেটিং করার সময় কোথায়? গুড মর্নিং!'

আর কোন কথা হলো না। দু'জন দু'দিকে চলে গেল আপন আপন কাজে।

স্ক্রুজ প্রথমটায় কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না, একমিনিটের এই তুচ্ছ আলাপটা ভূত শুনতে বলল কেন। পরে ভাবলেন, আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কী সেই কারণ? যে-মৃত্যু নিয়ে ওরা আলাপ করছে সেটা কোনমতেই জ্যাকবের মৃত্যুসংবাদ হতে পারে না। জ্যাকবের মৃত্যু তো তিনি নিজের চোখেই দেখেছেন, কিন্তু এই মৃত্যু ঘটবে ভবিষ্যতে। তাঁর পরিচিতদের মধ্যে কি এই মুহূর্তে এমন কেউ আছে, যে খুব শিগগির মারা যেতে পারে? না, সেরকম কারও কথাও তো মনে পড়ছে না। তবে তিনি বুঝুন আর না-ই বুঝুন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ওদের আলাপের মধ্যে তাঁকে শোধরানোর মত কিছু অবশ্যই আছে। সুতরাং যা দেখবেন বা যা শুনবেন, নিখুঁতভাবে মনে রাখতে হবে। বিশেষ করে মনে রাখতে হবে ভবিষ্যতের স্ক্রুজের কথা। ভবিষ্যতে তিনি কেমন হবেন, দেখার জন্যে বড়ই উতলা হয়ে আছে তাঁর মনটা। এমনও তো হতে পারে যে, এত চেষ্টা করেও যা বুঝতে পারছেন না, তাঁর ভবিষ্যৎ-আচরণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সেই জটিল ধাঁধার জবাব।

দিনের এই সময়টিতে তিনি যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে অভ্যস্ত, সে জায়গাটা ভালভাবে লক্ষ করলেন স্ক্রুজ। একটা লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু তার সাথে তাঁর চেহারার কোন মিল নেই। এ-ছাড়া গাড়িবারান্দা দিয়ে হুড়মুড় করে যেসব লোক ঢুকছে, তাদের মধ্যেও নিজেকে খুঁজে পেলেন না

তবে এজন্যে খুব অবাক হলেন না তিনি, দেখতে পাওয়া যাবেই কখনও বা কখনও। শুধু, এই যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে চলেছে তাঁর মধ্যে, ভবিষ্যতের স্ক্রুজকে তিনি সেই পরিবর্তিত রূপেই দেখতে চান।

এতক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন বলে ভূতটার অস্তিত্বই ভুলে গিয়েছিলেন স্ক্রুজ চমকে উঠে তাকাতে দেখলেন, পাশেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভূতটা। আবার মনে হলো, অদৃশ্য দুটো চোখ যেন চেয়ে রয়েছে জ্বলজ্বল করে। সারা শরীর কেঁপে উঠল তাঁর, হাত পা অসাড় হয়ে গেল ঠাণ্ডায়।

এবারে তিনি পৌঁছুলেন শহরের অখ্যাত এক জায়গায়। এখানে আগে কখনও আসেননি, যদিও এটার অবস্থান তাঁর জানা ছিল। এখানকার অনেক দুর্নাম তাঁর কানে এসেছে। রাস্তাগুলো ছোট ছোট, ভীষণ নোংরা। দোকানপাট আর ঘরবাড়িগুলোর অবস্থাও করুণ। অধিবাসীরা মাতাল, অর্ধনগ্ন, কুৎসিত। রাস্তার দু-পাশ দিয়ে নেমে গেছে সরু সরু গলি, প্রত্যেকটাই বোঝাই হয়ে আছে আবর্জনায়। মোটকথা, পুরো জায়গাটা জুড়ে রাজত্ব করছে দুর্গন্ধ, দুর্দশা আর অপরাধ।

বেশ কিছুটা এগোতে অত্যন্ত নিচু ছাদঅলা একটা বাড়ির ভেতরে ছোট্ট একটা দোকান দেখতে পেলেন স্ক্রুজ। লোহা, পুরানো ন্যাকড়া, বোতল, হাড়, এমনকি নাড়ীভুঁড়িও কেনা হয় এখানে। মেঝের ওপর পড়ে আছে মরচে-ধরা চাবির স্তূপ, পেরেক, গজাল, শেকল, কব্জা, র‍্যাঁদা, লোহার পাত, বাটখারা এবং যাবতীয় রকমের পরিত্যক্ত লোহা। সব মিলিয়ে দোকানটার চেহারা এতই বিদঘুটে যে, ওই ন্যাকড়া, হাড় আর পচা চর্বির স্তূপের নিচে যদি মারাত্মক বেআইনী কোন জিনিসও থাকে, সেগুলো দেখার ইচ্ছে বা ধৈর্য কারোরই হবে না। আর এসব জিনিসপত্রের মাঝখানে, পুরানো ইটের তৈরি একটা চুলোর পাশে বসে আছে সাংঘাতিক বদমাশ চেহারার এক লোক। বয়স সত্তরের কম হবে না, পেকে গেছে মাথার চুল। দুই পা ছড়িয়ে আয়েশ করে পাইপ টানছে বুড়ো।

স্ক্রুজ দোকানটায় পৌঁছার পরপরই ভারী একটা বস্তা নিয়ে সন্তর্পণে দোকানে এসে ঢুকল এক মহিলা। সে ঢুকতে না ঢুকতেই একই রকম বস্তা নিয়ে এল আরেকজন মহিলা, আর ঠিক তার পেছনে পেছনে একটা লোক। মহিলা দু'জনকে দেখে চমকে উঠল লোকটা, মহিলা দু'জনও তাকে দেখে কম চমকাল না, তারপর তিনজনেই হেসে উঠল হো হো করে। বুড়োও যোগ দিল সে-হাসিতে।

'প্রথমে বুঝে নাও ঝি-র জিনিস!' বলল প্রথম মহিলা। 'তারপর আমার; তারপর আণ্ডারটেকারের সাগরেদের। বুড়ো জো, আজ তোমার ভাগ্য খুব ভাল! ভেবে দেখো, আমরা তিনজন তো অন্য দোকানেও যেতে পারতাম!'

'যেখানেই যাও, এত ভাল জায়গা আর কোথাও পাবে না,' মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে বলল বুড়ো জো। 'চলো, বারান্দায় যাই। তুমি যেমন আমার পরিচিত, এরা দু'জনও তেমনি অপরিচিত নয়। দাঁড়াও, আগে দরজাটা বন্ধ করে দিই। এঃ! কি শব্দ! মরচে-পড়া অনেক জিনিস আছে এখানে, কিন্তু এই কব্জাগুলোর কাছে সব হার মানবে: আর এ-ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত যে, অনেক হাড় থাকলেও আমার চেয়ে পুরানো হাড় এখানে একটাও নেই। হা হা হা! কাজের কথায় আসি।

তোমরা অদ্ভুত জিনিস দিতে চাও, আমিও অদ্ভুত জিনিস নিতে চাই–আমরা তৈরিই হয়েছি একে অপরের জন্যে। চলো, চলো, বারান্দায় চলো!'

বারান্দা বলতে ছেঁড়া ন্যাকড়ার পর্দাঘেরা একফালি জায়গা। তিনজনকে নিয়ে সেখানে গিয়ে একটা স্টেয়ার-রড দিয়ে খুঁচিয়ে আগুন উসকে দিল বুড়ো, তারপর পাইপের গোড়া দিয়ে বাতি কমিয়ে আবার মুখে পুরল পাইপটা।

ইতোমধ্যে বস্তা রেখে একটা টুলের ওপর গ্যাট হয়ে বসে পড়ল ঝি, কনুই দুটো হাঁটুর ওপর রেখে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাল অন্য দু'জনের দিকে।

'জিনিসগুলো আনতে খুব অসুবিধে হয়েছে আমার। তোমার হয়নি, মিসেস ডিলবার?' বলল ঝি। 'তবে, নিজের জিনিস সামলে রাখার অধিকার তো সবারই আছে, তাই না? আর, সে সারা জীবন ধরেই এটা করে এসেছে।'

'হ্যাঁ!' বলল প্রথম মহিলা, সে একজন ধোপানী। 'নিজের জিনিস ওর মত করে আর কেউই বুঝি কখনও সামলে রাখেনি।'

'সবই তো বোঝ দেখছি! তাহলে আর অযথা ভয়-ভয় মুখ করে আছ কেন? আমরা তো আর একে অপরের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে যাচ্ছি না!'

'না, না!' একইসাথে বলে উঠল মিসেস ডিলবার আর আণ্ডারটেকারের সাগরেদ। 'সেটা মোটেই উচিত হবে না।'

'বেশ, বেশ!' চেঁচিয়ে উঠল ঝি। 'আর এসব টুকিটাকি জিনিস হারিয়ে গেলে কারোরই কোন ক্ষতি হবে না। বিশেষ করে, মৃত কোন মানুষের তো সে প্রশ্নই ওঠে না, কি বলো?'

'হ্যাঁ,' হেসে উঠল মিসেস ডিলবার।

'সারাজীবন ধরে জিনিস আগলে রাখলেও, মরার পরে ওগুলো সামলে রাখার ব্যবস্থাটা আর করে যায়নি বুড়ো,' বলল ঝি, 'মানুষের সাথে সদয় ব্যবহার করা উচিত ছিল ওর। তাহলে শেষ সময়ে কেউ না কেউ মাথার কাছে থাকত, ওভাবে বেঘোরে একা একা মরতে হত না।'

'খাঁটি সত্যি কথা বলেছ তুমি,' বলল মিসেস ডিলবার। 'উচিত বিচারই হয়েছে ওর।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল ঝি; 'আরেকটু কড়া ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল বুড়োর। যাকগে। বস্তাটা খোলো দেখি, জো, জিনিস দেখে ঝটপট জানিয়ে দাও আমার পাওনাটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারটাই আগে খোলো, ওদের সামনেই খোলো– আমি পরোয়া করি না। এখানে আসার আগে যে আমরা একই কাজ করছিলাম, এটা বুঝতে আর আমাদের কারও বাকি নেই। ওতে পাপের কিছু নেই। বস্তাটা খোলো, জো, দামের ব্যাপারে কোনরকম টালবাহানা করবে না।'

ঝি মহিলাটি কথায় খুব পটু, চালাকও বটে। কিন্তু অন্য দু'জনও কম যায় না। এতক্ষণ ধরে ঝিয়ের কথা শুনলেও কথার মারপ্যাচে তারা ভুলল না। সবচেয়ে আগে পুঁটলি খুলল সাগরেদ। খুব বেশি মাল তার নেই। গোটাদুয়েক সীলমোহর, একটা পেন্সিল-কেস, একজোড়া কাফ-লিংক আর কমদামী একটা ব্রোচ। বারবার জিনিসগুলো পরীক্ষা করে, চক দিয়ে দেয়ালের ওপর ওগুলোর দাম লিখতে লাগল বুড়ো জো। তারপর যখন দেখল আর কিছু নেই, যোগ করে ফেলল সে।

'এই যে তোমার হিসেব,' বলল জো, 'আমাকে পুড়িয়ে মারলেও এর চেয়ে আধ শিলিং বেশি পাবে না। এবার কার পালা?'

এগিয়ে গেল মিসেস ডিলবার। সে এনেছে কয়েকটা চাদর আর তোয়ালে, ছোট একটা জামা, আদ্যিকালের দুটো রূপোর চা-চামচ, একজোড়া চিনি তোলার চিমটে, আর গোটাকতক জুতো। একই কায়দায় এই জিনিসগুলোরও দাম হিসেব করল জো।

তারপর বলল, 'মেয়েদের প্রতি আমি বরাবরই উদার। আর সেজন্যেই ব্যবসায় উন্নতি করতে পারলাম না। যা দাম হওয়া উচিত, তার চেয়ে অনেক বেশি দিচ্ছি তোমাকে। আর যদি একটা পেনিও চাও, নিজের উদারতার জন্যে আপসোস হবে আমার। এবং সেক্ষেত্রে হিসেব থেকে কেটে নেব আধ ক্রাউন।'

'এবার আমার জিনিসগুলো দেখো, জো,' বলল ঝি।

বস্তা খোলার সুবিধার্থে হাঁটু গেড়ে বসল জো। বেশ কয়েকটা গিঁঠ খুলতে ভেতর থেকে বেরোল বড়োসড়ো একটা কালো বাণ্ডিল।

'এগুলোকে যেন কি বলো তোমরা?' বলল জো। 'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে—বেড-কার্টেন্‌স্!'

'হ্যাঁ!' হাসতে হাসতে হাতদুটো ভাঁজ করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল মহিলা। 'বেড-কার্টেন্‌স্!'

'ওর মৃতদেহটা ওভাবে ফেলে রেখেই এগুলো নিয়ে এসেছ নাকি?' বলল জো। 'না, না, তা হতে পারে না!'

'কেন পারে না?' বলল মহিলা। 'অসুবিধেটা কোথায়?'

'ভাগ্য নিয়েই জন্মেছ তুমি, সেইসাথে আছে সাহস,' বলল জো, 'কেউ ঠেকাতে পারবে না তোমাকে।'

'হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে, এমন কোন জিনিস নেয়ার বেলায় হাতকে আমি বাধা দিই না,' ঠাণ্ডা গলায় বলল মহিলা। 'আর, ওর মত লোকের জিনিস নেয়ার ক্ষেত্রে তো সে প্রশ্নই ওঠে না। কম্বলের ওপর তেল ফেল না, জো।'

'কম্বলগুলোও ওর নাকি?' জানতে চাইল জো।

'নয়ত কার?' জবাব দিল মহিলা। 'এখন তো আর ওই কম্বল কোন কাজে লাগবে না। মৃতদের ঠাণ্ডা লাগে না।'

'সংক্রামক কোন রোগে ওর মৃত্যু হয়নি তো?' আবার জানতে চাইল জো।

'অযথা যতসব ভয় তোমার,' বলল মহিলা। 'যদি সেরকম কোন অসুখ থাকত, তাহলে কি আর আমি ওর পিছে পিছে ঘুরতাম? কী দেখছ অতক্ষণ ধরে? যতই চেষ্টা করো, কোন খুঁত বের করতে পারবে না। এটাই ওর সবচেয়ে ভাল শার্ট, কাপড়টা সত্যিই দামী। আমি না নিয়ে এলে শার্টটা নষ্ট করে ফেলত ব্যাটারা।'

'কীভাবে?' বলল জো।

'শার্টসহ ওকে কবর দিয়ে,' হেসে উঠল মহিলা। 'সবাই অবশ্য নিষেধ করছিল, কিন্তু এক বেকুব কিছুতেই শুনল না। ফলে, আমাকে আবার কষ্ট করে

পরে খুলে নিতে হলো। মানুষ মরে গেলে তাকে শার্ট পরিয়ে দিলেই বা কি, আর খালি গায়ে রাখলেই বা কি। একটুও যদি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে কারও!'

নাড়ীভুঁড়ি আর হাড়ের স্তূপের পাশে বসে মহিলার কথা শুনতে শুনতে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন স্ক্রুজ, সেইসাথে ঘৃণায় রিরি করে উঠল তাঁর সারা শরীর। মৃতদেহের গা থেকে কাপড় খুলে নেয়ার মত নীচ কাজ মানুষের পক্ষে সম্ভব? সম্ভব যে, তা তো চোখের সামনেই দেখছেন। মনে হয়, এরা মৃতদেহ বিক্রি করতেও দ্বিধা করবে না!

'হা হা!' বুড়ো জো-কে টাকাভর্তি একটা ফ্ল্যানেলের ব্যাগ বের করতে দেখে আবার হেসে উঠল মহিলা। 'মৃত্যুই হলো সবকিছুর শেষ! বেঁচে থাকতে বুড়োর কাছ থেকে কিছু পাবার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি কেউ, অথচ মরার পর আমরা অনায়াসে পেয়ে যাচ্ছি! হা হা হা!'

'ভূত!' আপাদমস্তক কেঁপে উঠলেন স্ক্রুজ। 'আমি বুঝতে পেরেছি! বুঝতে পেরেছি, কেন আপনি আমাকে এগুলো দেখাচ্ছেন! আমার অবস্থাও হতে পারে ওই অসুখী লোকটার মত! হায় ঈশ্বর, এসব আমি কী দেখছি!'

আতঙ্কের এই ঘোর কাটতে না কাটতেই বদলে গেল দৃশ্যপট। একটা বিছানার পাশে নিজেকে আবিষ্কার করলেন স্ক্রুজ। কোন চাদর নেই বিছানাটায়, লম্বামত একটা জিনিস শুধু ঢাকা দেয়া আছে ময়লা একটা কম্বল দিয়ে। কিছুই দেখা না গেলেও স্ক্রুজের অন্তরাত্মা পর্যন্ত বুঝতে পারল, জিনিসটা কী!

ভীষণ অন্ধকার ঘরের ভেতরে। এত অন্ধকার যে, খুব চেষ্টা করলে চোখ চলে বটে, কিন্তু কোন জিনিসই ভালভাবে দেখা যায় না। তবু ঘরটা কেমন, বোঝার চেষ্টা করলেন স্ক্রুজ। লাভ হলো না। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্ষীণ, ফ্যাকাসে একটা আলো জেগে উঠল বাইরের পৃথিবীতে, আর সেই আলো এসে পড়ল বিছানার ওপর। অত্যন্ত অযত্নে পড়ে আছে একটা মানুষের মৃতদেহ। পাহারা দেয়ার মত কেউ নেই মানুষটার, কেউ নেই মাথার কাছে বসে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলার মত।

চোখ তুলে চাইলেন স্ক্রুজ। ভূতটা হাত বাড়িয়ে মৃতদেহের মাথা নির্দেশ করছে। কম্বলটা মৃতদেহের ওপর এতই অযত্নে ফেলে রাখা আছে যে, আঙুল দিয়ে টোকা দিলেও বোধ হয় খসে পড়বে। টোকা দেয়ার ইচ্ছেও হলো তাঁর, মুখটা একনজর দেখার জন্যে ছটফট করে উঠল মন, কিন্তু তারপরেই হঠাৎ করে অবশ হয়ে এল সারা শরীর।

মৃত্যু! শীতল, অপরাজেয়, ভয়াবহ মৃত্যু! সাজাও ওই মৃতদেহ তোমার ভয়ঙ্কর হাতে, তছনছ করো ইচ্ছেমত! আজ তোমারই তো রাজত্ব! কিন্তু পৃথিবীতে যাঁরা শ্রদ্ধাভাজন, তাঁদের একটা চুল নাড়ানোর ক্ষমতাও তোমার নেই। পৃথিবী থেকে বড় জোর তাঁদের শরীরটাই নিয়ে যেতে পারবে তুমি, কিন্তু স্মৃতি নিয়ে যেতে পারবে না!

একটা শব্দও হয়নি ঘরের ভেতরে, তবু কথাগুলো যেন স্পষ্ট শুনতে পেলেন স্ক্রুজ। এখন যদি লোকটাকে তুলে তার মৃতদেহটা দেখানো যেত, কী ভাবত সে? অবাক হয়ে দেখত, ধন-লালসা, নিষ্ঠুরতা আর প্রত্যেকটা ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত

যত্ন জীবনে তাকে বিরাট ধনী করে তুললেও, মৃত্যু একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছে তাকে।

অন্ধকার, শূন্য একটা ঘরে অবহেলায়, অনাদরে পড়ে আছে সে। কোন মহিলা কিংবা শিশু তার স্মৃতিচারণ করছে না। কেউ বলছে না, একদিন আমার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেছিল বলে আজ আমিও শত কাজ ফেলে ছুটে এসেছি তাকে দেখতে মানুষের বদলে একটা বিড়াল আঁচড় কাটছে দরজায়, ফায়ারপ্লেসের ওপাশে কী যেন চিবোচ্ছে একটা ইঁদুর। মৃতের ঘরে বিড়াল আর ইঁদুরের কী প্রয়োজন, কেনই বা তারা অস্থির হয়ে উঠছে—ভাবার সাহস পেলেন না স্ক্রুজ।

'ভূত!' বললেন তিনি, 'জায়গাটা খুব ভয়ঙ্কর। বিশ্বাস করুন, এখান থেকে চলে গেলেও, যে শিক্ষা এখানে পেলাম, তা কখনোই ভুলব না। চলুন, অন্য কোথাও যাই।'

এক চুলও নড়ল না ভূতটা, তেমনি অঙ্গুলি নির্দেশ করে রইল মৃতের মাথা লক্ষ্য করে।

'আপনি কি বলতে চান, আমি বুঝতে পারছি,' বললেন স্ক্রুজ, 'পারলে, সরিয়ে দিতাম মুখের কাপড়টা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সে শক্তি আমার নেই।'

আবার যেন তার দিকে তাকিয়ে রইল ভূতটা।

'এই শহরে কি এমন একজনও নেই, যে এই মৃত্যুসংবাদ শুনে অন্তত কিছুটা আবেগ অনুভব করেছে?' বললেন স্ক্রুজ, 'যদি থাকে, আমাকে দেখান, আপনাকে মিনতি করছি!'

নিজেকে ঝাঁকি দিল ভূতটা, তার কালো পোশাক উড়ে উঠল বাদুড়ের ডানার মত। সঙ্গে সঙ্গে রাতের পরিবর্তে নেমে এল দিন। দেখা গেল, একটা ঘরের ভেতরে ছেলেকে নিয়ে বসে আছে মা।

একটু পরে উঠে পায়চারি শুরু করল মহিলা; কারও পথ চেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে সে। বারবার ঘড়ি দেখছে; জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিচ্ছে বাইরে; চমকে উঠছে যে-কোন শব্দে। সেলাই করতে বসল, তাতেও মন লাগল না। রাস্তা থেকে ভেসে আসা বাচ্চাদের চিৎকার অসহ্য লাগছে তার। সারাদিন খেলা ছাড়া আর কোন কাজ নেই শয়তানগুলোর!

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত সেই টোকা শোনা গেল। দরজার দিকে দ্রুত ছুটে গেল মহিলা। দরজা খুলতে ভেতরে ঢুকল তার স্বামী। বয়সে যুবক হলেও দুশ্চিন্তাপীড়িত বিমর্ষ চেহারা তার। অবশ্য এই মুহূর্তে তীব্র একটা আবেগে অস্থির হয়ে উঠেছে সে, কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে লজ্জা লাগছে তার।

ডিনার সাজিয়ে রাখা ছিল ফায়ারপ্লেসের পাশে। খেতে বসার অনেকক্ষণ পর ক্ষীণ কণ্ঠে মহিলা জানতে চাইল, খবর কি ! বিব্রতমুখে ইতস্তত করতে লাগল লোকটা, বুঝে উঠতে পারল না, ঠিক কীভাবে জবাব দেবে।

'ভাল?' বলল মহিলা, 'নাকি খারাপ?'

'খারাপ,' জবাব দিল লোকটা।

'আমরা শেষ হয়ে গেছি একেবারে?'

'না। আ[illegible] এখনও একটু আছে, ক্যারোলিন।'

'হ্যাঁ,' বলল ক্যারোলিন, 'যদি সে ভাল হয়ে ওঠে! এর চেয়ে আরও অনেক কঠিন অসুখও তো সেরে যায় মানুষের!'

'কিন্তু এই অসুখ আর সারবে না,' বলল স্বামীটি। 'মারা গেছে বুড়ো।'

মুখ দেখে মনে হয়, যথেষ্ট ধৈর্য আছে মহিলার। কিন্তু বুড়োর মৃত্যুসংবাদ শুনে আবেগ চেপে রাখতে না পেরে হাততালি দিয়ে উঠল সে, পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল।

'গত রাতে আধা-মাতাল যে-মহিলাটির কথা তোমাকে বলেছিলাম, ঠিকই বলেছিল সে। যদিও আমি ভেবেছিলাম, সে আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছিল। আমি যখন বুড়োর কাছে এক সপ্তাহ সময় চাইতে গিয়েছিলাম, তখন শুধু অসুস্থই ছিল না সে, মৃত্যুও ঘনিয়ে এসেছিল তার।'

'ঋণটা এখন কাকে শোধ করতে হবে?'

'জানি না। তবে সে-ঋণ দাবি করতে করতে নিশ্চয় টাকা জোগাড় করে ফেলতে পারব আমরা। আর যদি না-ও পারি, তার উত্তরাধিকারীও যে তার মত কসাই হবে, এমন কোন কথা আছে? কিন্তু কসাই-ই যদি হয়, বুঝব, আমাদের চেয়ে দুর্ভাগা পৃথিবীতে আর কেউ নেই। যা-ই হোক, আজ রাতে অন্তত আরাম করে ঘুমানো যাবে, ক্যারোলিন!'

হ্যাঁ। আজ অন্তত শান্তি নেমে এসেছে বাড়িটাতে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুমানোর ভান করে সব কথাই শুনল বাচ্চারা। কিছু বুঝল, বেশির ভাগই বুঝল না। কিন্তু যেটুকু বুঝল, তাতেই খুশিতে ভরে উঠল সবার মুখ। একজনের মৃত্যু এখানে শান্তি বয়ে এনেছে! মৃত্যুটার সাথে আবেগের সম্পর্ক দেখতে চেয়েছিলেন স্ক্রুজ। কিন্তু সে-আবেগ যে এরকম হবে, স্বপ্নেও ধারণা করেননি।

'মৃত্যুতে মানুষের শোক-সহানুভূতির একটা দৃষ্টান্ত দেখান,' বললেন স্ক্রুজ: 'তাছাড়া মৃতের সেই অন্ধকার ঘরের দৃশ্য কিছুতেই আমার স্মৃতি থেকে মুছবে না।'

এবার পরিচিত রাস্তা ধরে তাঁকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ভূতটা। যেতে যেতে তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশে তাকাতে লাগলেন স্ক্রুজ, কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলেন না নিজেকে। অবশেষে হঠাৎ একসময় চোখের সামনে দেখতে পেলেন বব ক্র্যাচিটের বাড়ি। সন্তানদের নিয়ে আগুনের পাশে বসে আছে মিসেস ক্র্যাচিট।

একেবারে নিঃশব্দ হয়ে আছে বাড়িটা। একহাজার এক রকম শব্দ করে যে বাচ্চারা, তারাও যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে আজ। একটা বই খুলে বসে আছে পিটার, চুপচাপ সেদিকেই তাকিয়ে আছে সবাই। মা আর মেয়ে সেলাই করছে।

'এই পরিবারের একটা বাচ্চাকে নিয়ে গেছেন ঈশ্বর। সে-কথা এদের কেউ ভুলতে পারছে না।'

চমকে উঠলেন স্ক্রুজ। কে কথা বলল? স্বপ্নে শুনেছেন? না, তিনি তো জেগেই আছেন! তাহলে বোধ হয় পিটার বই পড়ছিল। কিন্তু ওইটুকু পড়েই থেমে গেল কেন?

সেলাইটা টেবিলে নামিয়ে রেখে, একটা হাত তুলে চোখ আড়াল করল মিসেস ক্র্যাচিট।

বলল, 'বড় চোখে লাগছে রঙটা।'

নিঃশব্দে কেটে গেল কয়েক মিনিট।

'এখন ভাল লাগছে অনেকটা,' আবার বলল মিসেস ক্র্যাচিট। 'মোমবাতির আলোয় একনাগাড়ে কাজ করলে চোখ ধরে যায়। এই চোখ নিয়ে তোমাদের বাবার সামনে যেতে পারব না। তার আসার সময় প্রায় হয়ে এল।'

'সময় পার হয়ে গেছে,' বই বন্ধ করে বলল পিটার। 'গত কয়েকদিন ধরেই এমন দেরি হচ্ছে, মা। হাঁটার গতি যেন কমে গেছে বাবার।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল সবাই। এক সময় কিছুটা খুশি-খুশি গলায় মিসেস ক্র্যাচিট বলে উঠল, 'আমি তোদের বাবার সাথে হেঁটেছি—টাইনি টিমকে কাঁধে নিয়ে খুব জোরে জোরে হাঁটত।'

'আমিও বাবার সাথে হেঁটেছি,' বলল পিটার। 'আগে প্রায় হাঁটতাম আমরা।'

'আমিও,' বলল আরেকজন।

'আমরাও,' সমস্বরে গলা মেলাল বাচ্চারা।

'টাইনি টিম একেবারে হালকা ছিল,' সেলাই করতে করতে বলল মিসেস ক্র্যাচিট, 'তাছাড়া ওর বাবা ওকে খুব ভালবাসত বলে হয়তো ওর ওজনটা টেরই পেত না। ওই যে, এসে গেছে তোদের বাবা!'

ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল মিসেস ক্র্যাচিট। ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকে আগুনের পাশে গিয়ে বসে পড়ল বব। সাদা মাফলারটা যথারীতি গলায় জড়ানো, ভীষণ বিষণ্ণ হয়ে আছে মুখটা। চা তৈরিই ছিল। বাবাকে কে চা দেবে, এই নিয়ে সামান্য হুড়োহুড়ি হলো বাচ্চাদের মধ্যে। শেষমেশ এগিয়ে এল ছোট দুই ভাইবোন। চা দিয়ে বাবার হাঁটুর ওপর উঠে বসল ওরা। দু-পাশ থেকে ছোট্ট ছোট্ট দুটো গাল চেপে ধরল বাবার গালে। যেন বলতে চাইল, 'দুঃখ কোরো না, বাবা। তোমার দুঃখী চেহারা যে সইতে পারি না আমরা!'

সন্তানের মায়াভরা ছোঁয়ায় সত্যিই যেন দুঃখ অনেকটা হালকা হয়ে গেল ববের। সবার সাথে হেসে হেসে কথা বলতে লাগল সে। টেবিলের ওপর রাখা সেলাইটা দেখে প্রশংসা করল মা ও মেয়ের। বলল, যেভাবে এগোচ্ছে তাতে রোববারের অনেক আগেই শেষ হয়ে যাবে কাজ।

'রোববার! আজও তাহলে তুমি ওখানে গিয়েছিলে, তাই না, রবার্ট?' বলল মিসেস ক্র্যাচিট।

'হ্যাঁ,' বলল বব। 'যাবার পর খুব মনে পড়ছিল তোমাদের কথা। গেলে দেখবে, কী চমৎকার সেই জায়গা! চারপাশটা এত সবুজ যে মনে হয়, হঠাৎ করে যেন চলে এসেছি পান্নার তৈরি কোন দ্বীপে। গেলে খুব ভাল লাগবে তোমাদের। ওকে কথা দিয়ে এসেছি, সবাই মিলে যাব কোন এক রোববারে। টাইনি টিম!' ফুঁপিয়ে উঠল বব। 'বাছা আমার!'

হঠাৎ করেই ভেঙে পড়ল বব। গত কয়েকদিন ধরেই এরকম হচ্ছে তার। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণ থাকছে না নিজের ওপর।

ওপরতলায় উঠে এসে একটা ঘরে ঢুকল বব। চারপাশে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো। ক্রিসমাসের গন্ধ যেন এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। ছোট্ট একটা চেয়ার এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, যেন একটু আগেই এখানে বসে ছিল কেউ। চেয়ারটায় কিছুক্ষণ বসে থাকল বেচারি, ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল মন। সবসময় শোক করলে তো মানুষ বাঁচে না–নিজেকেই নিজে বোঝাল সে। যা ঘটে গেছে, তা মেনে নিতেই হবে। হাসিমুখে আবার নিচতলায় নেমে সবার সাথে যোগ দিল সে।

শুরু হলো নানারকম গল্প। রাত গভীর হবার সাথে সাথে আগুনের আরও কাছে সরে এল সবাই। এখনও সেলাই করছে মা আর মেয়ে। হঠাৎ করে স্ক্রুজের ভাগনের প্রসঙ্গ তুলল বব। বলল, 'জীবনে এত ভদ্র মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। একদিনই মাত্র দেখা হয়েছে তাঁর সাথে, সে-ও দু-মিনিটের দেখা। অথচ সেদিন রাস্তায় শুকনো মুখে দেখে যখন জানতে চাইলাম, কী ব্যাপার, বললেন, তিনি সব শুনেছেন। বললেন, "আমি অন্তরিকভাবে দুঃখিত, মি. ক্র্যাচিট। আপনার যোগ্য সহধর্মিণীকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাবেন"। আচ্ছা, এ-কথাটা উনি জানলেন কীভাবে, বলো তো?'

'কোন কথা, ডিয়ার?'

'তুমি যে আমার যোগ্য সহধর্মিণী- এ-কথা উনি জানলেন কীভাবে?'

'সবাই জানে!' গম্ভীর মুখে বলল পিটার।

'চমৎকার!' বলল বব। 'তোর কথাই যেন সত্যি হয়! যাক যা বলছিলাম। তিনি বললেন, "আপনার যোগ্য সহধর্মিণীকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাবেন। এই নিন আমার কার্ড। এখানেই আমি থাকি। যে-কোন প্রয়োজনে দয়া করে যোগাযোগ করবেন"। কিন্তু আমাদের বাড়িতে যে-দুর্ঘটনাটা ঘটে গেছে, তাতে যে কারও সাহায্যই কোন কাজে লাগবে না,' আবার ফুঁপিয়ে উঠল বব, 'কিন্তু কথার মধ্যে সত্যিই আন্তরিকতার ছোঁয়া ছিল তাঁর। মনে হচ্ছিল, টাইনি টিমকে তিনি যেন কতদিন থেকে চেনেন! তাঁর সহানুভূতিতে কোন খাদ ছিল না।'

'তিনি যে খুব ভাল মানুষ, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই!' বলল মিসেস ক্র্যাচিট।

'আরও সন্দেহ থাকবে না,' বলল বব, 'যদি তাঁর সাথে তোমার কখনও কথা বলার সুযোগ হয়। আজ একটা কথা বলে রাখছি তোমাদের, কথাটা মনে রেখো। যদি পিটারের জন্যে তিনি কখনও কোন সুযোগ সৃষ্টি করে দেন, আমি অন্তত মোটেই অবাক হব না।'

'শুনে রাখো, পিটার,' বলল মিসেস ক্র্যাচিট।

'আর তারপর,' বলে উঠল মেয়েদের একজন, 'পিটার কোন একজনকে নিয়ে নিজের মত বেশ গুছিয়ে বসবে।'

'তুই বরং নিজের কথা ভাব,' বলল পিটার।

'সে তো হবেই কখনও,' বলল বব, 'তবে তার জন্যে অনেক সময় পড়ে আছে। অবশ্য এ-কথাও ঠিক যে, একদিন না একদিন আমাদের সবাইকেই আলাদা হয়ে যেতে হবে। কিন্তু যে যেখানেই থাকি না কেন, টাইনি টিমের কথা

আমরা কেউই ভুলব না। নাকি ভুলব?'

'কক্ষনও নয়, বাবা!' সমস্বরে বলল সবাই।

'আমি জানি,' বলল বব, 'ওর কথা কেউই ভুলতে পারব না আমরা। সবসময় মনে রাখব, অত ছোট হওয়া সত্ত্বেও কত শান্ত ছিল ও, কত ধৈর্য ছিল ওর। এসব মনে রেখে নিজেদের মধ্যে কখনও ঝগড়া করব না আমরা। নাকি ঝগড়া করতে করতে ওর কথা ভুলে যেতে চাও?'

'কক্ষনও নয়, বাবা!' সমস্বরে আবার বলে উঠল সবাই।

'সুখী হলাম,' বলল বব, 'খুব সুখী হলাম!'

স্বামীকে চুমো খেলো মিসেস ক্র্যাচিট, সন্তানেরা একে একে চুমো খেলো বাবাকে, সবশেষে বব হাত মেলাল পিটারের সাথে। টাইনি টিমের স্মৃতিকে ঘিরে যেন স্বর্গ নেমে এল বব ক্র্যাচিটের ছোট্ট বাড়িটিতে!

'ভূত,' বললেন স্ক্রুজ, 'অনুভব করছি, বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসছে, যদিও জানি না, তা কীভাবে আসবে। সুতরাং তাড়াতাড়ি বলুন, যে-মৃতদেহটা আমরা দেখলাম, সেটা কার?'

স্ক্রুজকে সাথে নিয়ে আবার এগিয়ে চলল অনাগত দিনের ক্রিসমাসের ভূত। স্ক্রুজের মনে হলো, রওনা দিতেই সময়টা যেন এগিয়ে গেল আরও ভবিষ্যতের দিকে। একটার পর একটা পথ পেরিয়ে গেল ভূতটা, কিন্তু কোনদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল না। বিভিন্নরকম যানবাহন, ব্যবসায়ীদের জটলা পাশ কাটালেন স্ক্রুজ, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোথাও দেখতে পেলেন না নিজেকে। তাহলে কি এরকম সাদামাঠাভাবেই এগিয়ে আসবে বিদায়ের ক্ষণ? না, না, তা হতে পারে না। মৃতদেহটা কার, সে-কথা যে জানা হলো না এখনও! উপায়ান্তর না দেখে থামার জন্যে ভূতটাকে মিনতি করলেন স্ক্রুজ।

'এখন যেদিক দিয়ে এগিয়ে চলেছেন,' বললেন স্ক্রুজ, 'এখানেই আমার অফিস। মানে অনেক দিন থেকে এখানেই ব্যবসা করছি আমি। ভবিষ্যতে আমি কেমন হব, দেখার সুযোগ দিন দয়া করে!'

ভূতটা থামল; অন্যদিকে নির্দেশ করল হাতটা।

'অন্যদিকে হাত বাড়াচ্ছেন কেন?' বললেন স্ক্রুজ। 'আমার অফিস তো ওইদিকে।'

বিন্দুমাত্র নড়ল না হাতটা।

অফিসের জানালার কাছে ছুটে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিলেন স্ক্রুজ। কোন সন্দেহ নেই, এটাই তাঁর অফিস। কিন্তু এখন আর এটা তাঁর নয়। আসবাবগুলো নতুন, চেয়ারে বসে আছে অন্য লোক। এখনও একই ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে আছে ভূতটা।

আবার ছুটে কাছে যেতেই রওনা দিল ভূত। কোনদিকে যাচ্ছেন, কোথায় যাচ্ছেন, কিছুই বুঝতে পারলেন না স্ক্রুজ। অনেকক্ষণ পর একটা লোহার গেটের কাছে এসে থেমে গেল ভূতটা। ঢোকার আগে চারপাশে নজর বোলালেন তিনি।

এটা কবরস্থান। এখানেই তাহলে কবর দেয়া হয়েছে হতভাগ্য লোকটাকে! কবরস্থানটা ঢেকে গেছে ঘাস আর আগাছায়। এদিকে এক কবরের ওপর আরেক

কবর উঠে যেন শ্বাসরোধ করতে চাইছে জায়গাটার।

কবরস্থানের মাঝখানে গিয়ে একটা কবরের দিকে হাত নামাল ভূতটা। কাঁপতে কাঁপতে এগোলেন স্ক্রুজ। ভূতটার চেহারায় কোনরকম পরিবর্তন ঘটেনি। তবু তাঁর মনে হলো, ভয়ঙ্কর কিছু একটা যেন অপেক্ষা করছে ওখানে।

'কাছে যাবার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দিন,' বললেন স্ক্রুজ। 'এখন যে ঘটনাগুলো দেখাচ্ছেন, সেগুলো কি ভবিষ্যতে ঘটবেই, নাকি ঘটার সম্ভাবনা আছে?'

স্থির হয়ে রইল ভূতটা।

'মানুষের আচরণ তার ভবিষ্যৎ পরিণতি নির্দেশ করে। মানুষ যদি তার স্বভাব বদলে নেয়, তবে তার পরিণতিও বদলে যায়।'

আগের মতই স্থির হয়ে রইল ভূত।

কাঁপতে কাঁপতে আবার এগোলেন স্ক্রুজ। কাছে গিয়ে ভূতের নির্দেশিত চরম অবহেলিত কবরটার দিকে তাকাতেই শিউরে উঠল তাঁর অন্তরাত্মা। পাথরের ওপর পরিষ্কার হরফে লেখা আছে—এবনেজার স্ক্রুজ।

'তাহলে কি খাটের ওপর পড়ে থাকা সেই মৃতদেহটা আমার?' চিৎকার দিয়ে, দু-হাতে মুখ ঢেকে, হাঁটু ভেঙে বসে পড়লেন তিনি।

কবরের দিকে নির্দেশ করা হাতটা চকিতে একবার তাঁকে নির্দেশ করেই আবার ফিরে গেল কবরের দিকে।

'না, ভূত! ওহ্ না, না, না!'

বিন্দুমাত্র নড়ল না ভূতটা।

'ভূত!' দু-হাতে কালো পোশাকটা আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'শুনুন! আমি আগে যেরকম মানুষ ছিলাম, এখন আর সেরকম নেই, ভবিষ্যতেও আগের অবস্থায় ফিরে যাবার কোনরকম সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এসব আমাকে দেখাবেন না। তাছাড়া, কোন আশাই যদি না থাকে, তাহলে আর আমাকে শোধরাবার চেষ্টা করে লাভ কি?'

এই প্রথম কেঁপে উঠল ভূতের হাতটা।

'মহানুভব ভূত,' আবার হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলেন স্ক্রুজ, 'একবার শুধু বলুন, পরিবর্তিত আচরণের মাধ্যমে আমার এই পরিণতি আমি এড়িয়ে যেতে পারব!'

আবার কেঁপে উঠল দয়ালু হাতটা।

'এখন থেকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ক্রিসমাস পালন করব আমি। অতীতের কথা মনে রাখব, বর্তমানের সাথে মানিয়ে চলব, আর প্রস্তুত হব ভবিষ্যতের জন্যে। ভূত তিনটের শিক্ষা চিরদিন অক্ষয় হয়ে রইবে আমার মনে। এখন আপনি শুধু বলুন, পাথরের ওপরের ওই লেখাটা আমি মুছে ফেলতে পারব!'

কথা বলতে বলতে ভূতের হাতটা চেপে ধরলেন স্ক্রুজ। ভূত মুক্ত করতে চাইল নিজেকে, সেজন্যে আরও শক্ত করে হাতটা চেপে ধরলেন তিনি। কিন্তু ভূতের সাথে মানুষ পারবে কেন। প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে হাত ছাড়িয়ে নিল ভূতটা।

নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে ঈশ্বরের কাছে একটা শেষ প্রার্থনা করার

উদ্দেশ্যে হাত তুললেন স্ক্রুজ, আর ঠিক তখনই অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল ভূতটার। শিথিল হয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল কালো পোশাকটা, পরমুহূর্তেই ভূতটা রূপান্তরির্ত হয়ে গেল একটা বেডপোস্টে।

পঞ্চম স্তবক

উপসংহার

চোখের পলকে ভূতটা রূপান্তরিত হয়ে গেল বেডপোস্টে। এই রূপান্তরে যতটা না অবাক হলেন স্ক্রুজ, তার চেয়ে বেশি অবাক হলেন, যখন খেয়াল করলেন যে, খাটটা তাঁর নিজের। ঘরটাও। সবচেয়ে বড়ো কথা, কালটা তাঁর নিজের–অতীত বা ভবিষ্যৎ নয়।

'অতীতের কথা মনে রাখব আমি, বর্তমানের সাথে মানিয়ে চলব, আর প্রস্তুত হব ভবিষ্যতের জন্যে!' বিড়বিড় করতে করতে খাট থেকে নামলেন স্ক্রুজ। 'ভূত তিনটের কথা কখনোই ভুলব না আমি। জেকব মার্লে। ঈশ্বর আর ক্রিসমাস আমাকে নতুন মানুষে রূপান্তরিত করেছে! কথাটা আমি নতজানু হয়ে স্বীকার করছি, জেকব, নতজানু হয়ে স্বীকার করছি!'

হুহু করে কেঁদে ফেললেন স্ক্রুজ। এতদিন ধরে যে বরফ জমাট বেঁধে ছিল তাঁর মনে, সব যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

'কই কিছুই তো চুরি হয়নি,' একটা বেড-কার্টেন বুকে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি, 'তাহলে ভূত যা দেখাল, তার সবকিছুই ছিল সম্ভাবনামাত্র! ইচ্ছে করলে পরিবর্তিত আচরণের সাহায্যে ওই পরিণতি আমি এড়িয়ে যেতে পারব! হ্যাঁ, এড়িয়ে আমাকে যেতেই হবে!'

কথা বলতে বলতে পাগলের মত নিজের কাপড়চোপড় ধরে টানাটানি করতে লাগলেন স্ক্রুজ।

'কী করা উচিত, কিছুই বুঝতে পারছি না।' হাসি-কান্না মিশ্রিত এক অদ্ভুত গলায় আবার কথা বলে উঠলেন তিনি। 'আমার শরীর এখন পালকের মত হালকা, দেবদূতদের মত সুখী আমি, স্কুলের ছেলেদের মত হাস্যোজ্জ্বল। মাতালের মত টলছি আমি। সবাইকে ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা। নববর্ষের প্রীতি জানাই গোটা জগৎকে। কে রে ওখানে! হি হি হি! এদিকে আয়!'

লাফাতে লাফাতে তিনি গিয়ে পৌঁছুলেন বৈঠকখানায়, তারপর হঠাৎ করেই একেবারে স্থির হয়ে গেলেন।

'ওই তো জইয়ের মণ্ডের পাত্রটা,' আবার তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাগলেন ফায়ারপ্লেসের চারপাশে। 'ওই তো দরজাটা, ওদিক দিয়েই ঢুকেছিল জেকব মার্লের ভূত। ওই তো ওই কোণটাতেই এসে বসেছিল বর্তমানকালের ক্রিসমাসের ভূত! আর ওই জানালাটার পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম ভূতের দল!

সবকিছু যেমন রেখে গিয়েছিলাম, তেমনি আছে। সুতরাং যা দেখেছি, সব সত্যি-সব সত্যি! হা হা হা!'

হা হা হা হা-হেসেই চললেন স্ক্রুজ। মানুষের মনে হাসির যে দরজা থাকে, সেটাতে খিল এঁটে দিয়েছিলেন তিনি, আজ তা খুলে গেছে অনাস্বাদিত এক আবেগের ছোঁয়ায়।

'আজ মাসের কত তারিখ, আমি জানি না!' বললেন স্ক্রুজ। 'জানি না, কতক্ষণ ছিলাম ভূতগুলোর সাথে। কিছুই জানি না আমি। কারণ, আমি শিশু। শিশুরা অত কিছু জানবে কোত্থেকে। আমি শিশু, এ-কথা শুনে আপনারা আবার রাগ করলেন নাকি? রাগ করলেন তো বয়েই গেল আমার! শিশু আমি হবই! কোন্ বদমাশ রে ওখানে! এদিকে আয়! আজ কাউকে কিছু বলব না! হি হি হি!'

হঠাৎ গির্জা থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসতেই বন্ধ হয়ে গেল তাঁর লাফালাফি। গির্জার ঘণ্টা কোনদিন এত মিষ্টি লাগেনি তাঁর কানে। ঝন্ঝন্, ঢং ঢং; ডিং, ড়ং। ডং, ডিং; ঢং ঢং, ঝন্ঝন্! আহ্, অসাধারণ, তুলনাহীন!

ছুটে গিয়ে জানালা খুললেন তিনি, মাথা বের করলেন বাইরে। নির্মেঘ কুয়াশাহীন উজ্জ্বল দিন। নাচার জন্যে মানুষের রক্ত খুঁজছে ঠাণ্ডা বাতাস। সোনালি ডানা মেলে দিয়েছে সূর্য। আহ্, অসাধারণ, তুলনাহীন!

'আজ কি বার রে?' রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া একটা ছেলের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলেন স্ক্রুজ।

'কী বললেন?' ছেলেটার বলার ধরনে মনে হলো, খুবই বিস্মিত হয়েছে সে।

'আজ কিসের দিন, বাবা?' বললেন স্ক্রুজ।

'আজ?' বলল ছেলেটা। 'আজ তো ক্রিসমাস!'

'ক্রিসমাস!' চমকে উঠলেন স্ক্রুজ। 'ক্রিসমাস তাহলে পার হয়ে যায়নি! এক রাতেই সব কাজ সেরে ফেলেছে ভূতেরা! নিশ্চয় তা-ই করেছে। ভূতের অসাধ্য কিছু নেই। তারা সব পারে। কেমন আছিস, বাবা?'

'ভাল, আপনি?' হাসিমুখে বলল ছেলেটা।

'সামনের রাস্তার মুরগির মাংসের দোকানটা চিনিস, ওই যে কোণের দিকে?' জানতে চাইলেন স্ক্রুজ।

'মনে হয়, চিনি,' বলল ছেলেটা।

'বুদ্ধিমান ছেলে!' বললেন স্ক্রুজ। 'চমৎকার ছেলে! ওখানকার বড় টার্কিটা বিক্রি হয়ে গেছে কিনা, বলতে পারবি? আমি জানি, তুই কোন্টার কথা ভাবছিস। না, ওটা নয়। গোটা দোকানের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় এবার বুঝতে পেরেছিস?'

'মানে, যেটা আমার সমান?' চমকে উঠল ছেলেটা।

'কী সুন্দর ছেলে!' বললেন স্ক্রুজ। 'সব বোঝে! এরকম ছেলের সাথে কথা বলার মজাই আলাদা! ঠিক ধরেছিস!'

'ওটাকে ঝুলতে দেখে এলাম এখনই,' বলল ছেলেটা।

'সত্যি?' বললেন স্ক্রুজ। 'যা, এখনই কিনে নিয়ে আয়।'

'যতসব ফালতু কথা!' অবিশ্বাসী গলায় বলল ছেলেটা।

'না, না, সত্যি বলছি। কিনে, টার্কিটাকে এখানে নিয়ে আসতে বল। তারপর আমি বলে দেব, কোথায় পাঠাতে হবে ওটাকে। এখনই ব্যাটাকে ধরে নিয়ে আয়, একটা শিলিং পাবি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরতে পারলে দেব আধ ক্রাউন!'

গুলির মত ছুটে গেল ছেলেটা।

'টার্কিটা আমি পাঠাব বব ক্র্যাচিটকে!' ফিসফিস করে যেন নিজেকেই বললেন স্ক্রুজ, তারপর হাসতে হাসতে কুটিকুটি হলেন। 'বেচারি ধারণাও করতে পারবে না, কে পাঠাল। টার্কিটা দুটো টাইনি টিমের সমান হবে। আর, দোকানের লোকটাকে যখন ববের ঠিকানা বলব, হাঁ হয়ে যাবে ব্যাটা!'

ঠিকানাটা লিখেই ফেললেন স্ক্রুজ। হাত বেশ কাঁপল, তবু লিখলেন কোনমতে। তারপর নিচতলায় নেমে দরজা খুলে অপেক্ষা করতে লাগলেন দোকানের লোকটার জন্যে। আর এই অপেক্ষা করতে করতেই চোখ গিয়ে পড়ল দরজার কড়ার ওপর।

'যতদিন বাঁচব, ভালবাসব এটাকে!' কড়াটার গায়ে মৃদু চাপড় মারতে মারতে বললেন স্ক্রুজ। 'এটার দিকে আমি তাকাই না বললেই চলে! এখন থেকে প্রত্যেকদিন তাকাব। কড়াটা ভারী চমৎকার!–এই যে, এসে গেছে টার্কি। তুমি কে, বাবা? যে-ই হও, মেরি ক্রিসমাস!'

টার্কিই বটে একটা! এত বড় আর ভারী যে বিশ্বাস হয় না, নিজের পায়ের ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকত পাখিটা। আর কাছে কেউ গেলে নিশ্চয় শেষ করে দিত ঠোকরাতে ঠোকরাতে।

'এটাকে তো ক্যামডেন টাউন পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব,' বললেন স্ক্রুজ। 'ক্যাব ডাকতে হবে।'

খুকখুক করে হাসতে লাগলেন স্ক্রুজ। হাসতে হাসতেই টার্কির দাম দিয়ে দিলেন তিনি, হাসতে হাসতেই মিটিয়ে দিলেন ক্যাবের ভাড়া, ছেলেটার দিকে আধ ক্রাউন বাড়িয়ে দেয়ার সময়েও হাসি থামল না তাঁর। অবশেষে, সবাই বিদায় হবার পর, হাসতে হাসতে কেঁদে ফেললেন স্ক্রুজ।

কিছুক্ষণ পর তিনি উঠে পড়লেন শেভ করার জন্যে। এই কাজটা এমনিতেই বেশ কঠিন, সব সময় তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়, তার ওপর এখন হাত কাঁপছে তাঁর। তবু, কাজটা শেষ করে ফেললেন তিনি। আজ তাঁর যেরকম অবস্থা, শেভ করতে গিয়ে নাকের ডগাটা কেটে পড়ে গেলেও বুঝি মন খারাপ হত না।

গোসল সেরে সবচেয়ে ভাল কাপড়টা গায়ে চড়ালেন স্ক্রুজ, তারপর বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। চারপাশে ছুটে চলেছে জনতার স্রোত। এই দৃশ্যই তাঁকে দেখিয়েছিল বর্তমানকালের ক্রিসমাসের ভূত। যার সাথেই দেখা হলো, তার দিকে চেয়ে হাসলেন স্ক্রুজ। ভাবসাব এতই খুশি খুশি লাগছিল তাঁর যে, দু'জন লোক সাহস করে বলেই ফেলল, 'গুড মর্নিং, স্যার! মেরি ক্রিসমাস!' স্ক্রুজের মনে হলো, এত চমৎকার কথা তিনি শোনেননি কোনদিন।

আরেকটু এগোনোর পর দূরে একজন ভদ্রলোককে দেখে খুশি হয়ে উঠলেন তিনি। ওই ভদ্রলোকই গতকাল তাঁর কাউন্টিং-হাউসে গিয়ে বলেছিল, 'এটা নিশ্চয় স্ক্রুজ অ্যাণ্ড মার্লে?' ভদ্রলোককে একটা কথা বলবেন বলে মুহূর্তের মধ্যে মনস্থির

করে ফেললেন তিনি। কথাটা শোনার পর ভদ্রলোকের চেহারা কেমন হবে ভেবে ভেতরটা নেচে উঠল তাঁর। দ্রুত হেঁটে চললেন তিনি ভদ্রলোকের উদ্দেশে।

'কেমন আছেন?' কাছে এগিয়ে গিয়েই দু-হাতে ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরলেন স্ক্রুজ। 'গতকাল আপনি চলে যাবার পর অনেক ভেবে দেখলাম, আপনার কথাগুলোয় যুক্তি আছে। মেরি ক্রিসমাস।'

'মি. স্ক্রুজ?'

'হ্যাঁ,' বললেন তিনি। 'ওটাই আমার নাম। শুনে হয়তো খুশি হবেন না, ক্ষমা চাইছি আমি। আর যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে আমি একটা কথা বলতে চাই'—ভদ্রলোকের কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বলতে লাগলেন স্ক্রুজ।

'হায় ঈশ্বর!' যেন দম বন্ধ হয়ে গেল ভদ্রলোকের। 'আপনি কি বুঝেসুঝে বলছেন, মি. স্ক্রুজ?'

'হ্যাঁ, বুঝেসুঝেই বলছি। এক ফার্দিং কম দেব না, এক ফার্দিং বাকিও রাখব না। এখন আপনি দয়া করে নিতে রাজি হলেই হয়।'

'মাই ডিয়ার, স্যার,' স্ক্রুজের হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন ভদ্রলোক। 'কী বলে যে আপনাকে—'

'কিছু বলবেন না, প্লীজ,' অনুরোধ করলেন স্ক্রুজ। 'আপনি বরং আমার ওখানে আসুন। কি, আসবেন তো?'

'নিশ্চয়!' গলা চড়ালেন ভদ্রলোক। উনি যে আসবেন, তাতে কোন সন্দেহ রইল না স্ক্রুজের।

'ধন্যবাদ,' বললেন তিনি। 'আপনি রাজি হলেন বলে খুব খুশি হলাম। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!'

গির্জায় গেলেন তিনি, হেঁটে বেড়ালেন রাস্তায় রাস্তায়, শিশুদের আদর করলেন, কথা বললেন ভিক্ষুকদের সাথে, উঁকি দিলেন বিভিন্ন বাড়ির রান্নাঘরে। এত ছোট ছোট ব্যাপারের মধ্যে যে এত আনন্দ ছড়িয়ে আছে, আগে কখনও বোঝেননি। বিকেলে তিনি রওনা দিলেন ভাগনের বাড়ির উদ্দেশে।

দরজার কাছে গিয়ে থেমে গেলেন স্ক্রুজ। বেশ কয়েকবার এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরির পর সাহস করে ঢুকেই পড়লেন ভেতরে।

বসে আছে অত্যন্ত সুন্দরী একটি মেয়ে। 'বাড়ির মালিক কোথায়? আছে, নাকি বাইরে গেছে?' জানতে চাইলেন স্ক্রুজ।

'আছেন, স্যার।'

'কোথায়, মা?'

'ডাইনিং-রুমে, স্যার। ওপরতলায়। চলুন, আপনাকে পথটা দেখিয়ে দিই।'

'ধন্যবাদ, আমি নিজেই যেতে পারব। ও আমাকে চেনে।'

ডাইনিং-রুমের দরজায় এসে পৌঁছুলেন স্ক্রুজ। লকটা ঘুরিয়ে উঁকি দিতেই দেখলেন, ভাগনে আর ভাগনে-বৌ ডাইনিং-টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন পরীক্ষা করছে। কম বয়েসী হাউসকীপারেরা বড় খুঁতখুঁতে হয়।

'ফ্রেড!' বললেন স্ক্রুজ।

'কে!' চমকে উঠল ফ্রেড, 'এটা কার গলা?'

'আমি, ফ্রেড, আমি। তোমার মামা। আমি এসেছি তোমাদের সাথে ডিনার খেতে। আমাকে ঢুকতে দেবে না, বাবা?'

মামা এসেছেন! চমকে উঠল ফ্রেড। কিন্তু অত করুণ গলায় ভেতরে ঢোকার অনুমতি চাইছেন কেন! কতদিন পর, তা-ও আবার ক্রিসমাসের দিনে একসাথে ডিনার খাওয়া হবে–এর চেয়ে আনন্দ যে আর কিছুই হতে পারে না! ভাগনের মত ভাগনে-বৌয়ের মুখও উদ্ভাসিত হয়ে উঠল খুশিতে। একটু পরেই আসতে লাগল অতিথিরা। এল টপার, এল গোলগাল শ্যালিকা, এল আরও অনেকে। হেসেখেলে চমৎকার কাটল দিনটা।

পরদিন খুব সকালে অফিসের দিকে রওনা দিলেন তিনি। অন্তত আজ বব ক্র্যাচিটের আগে তাঁকে পৌঁছুতেই হবে!

হ্যাঁ, পেরেছেন! তিনি পেরেছেন! ন'টা বাজল। বব এল না। সোয়া ন'টা। তবু পাত্তা নেই। পুরো সাড়ে আঠারো মিনিট পর এসে হাজির হলো বব ক্র্যাচিট।

মুহূর্তের মধ্যে নিজের খুপরিতে ঢুকে বসে পড়ল সে, হাত চলতে লাগল বিদ্যুদ্‌বেগে।

'এই যে, শুনছ!' চিরাচরিত ভঙ্গিতে গর্জে উঠলেন স্ক্রুজ। 'বলি, এত দেরি করে আসার অর্থটা কি? এভাবে ইচ্ছেমত এলে অফিস চলবে কেমন করে?'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, স্যার,' বলল বব। 'আজ সত্যিই অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় একটু বেশিই দেরি করে ফেলেছ আজ,' বললেন স্ক্রুজ। 'এখন দয়া করে এদিকে এসো দেখি।'

'এরকম দেরি বছরে মাত্র একবারই হয়, স্যার,' খুপরি থেকে স্ক্রুজের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে বলল বব। 'কথা দিচ্ছি, আর কখনোই দেরি করব না।'

'পরিষ্কার শুনে রাখো,' ধমকে উঠলেন স্ক্রুজ, 'এসব আর বরদাস্ত করব না আমি। অতএব আজ থেকে,' আসন থেকে লাফিয়ে উঠে ববের ওয়েস্টকোট ধরে এত জোরে টান দিলেন যে, পড়তে পড়তে কোনরকমে নিজেকে সামলে নিল বেচারি; 'অতএব আজ থেকে বাড়িয়ে দিচ্ছি তোমার বেতন!'

কাঁপতে লাগল বব। স্ক্রুজ যে পাগল হয়ে গেছেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই রইল না তার। মুহূর্তের জন্যে একবার মনে হলো, টেবিলের ওপর থেকে রুমালটা তুলে নিয়ে বসিয়ে দেবে বুড়োর মাথায়। কিন্তু কিছুই করল না সে। এদিকে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তার জন্যে।

'মেরি ক্রিসমাস, বব!' স্ক্রুজের মুখে এ-কথা শুনে কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল ববের, কিন্তু গলাটা যে সত্যিই খুব আন্তরিক শোনাচ্ছে! বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতে না কাটতেই সস্নেহ চাপড় এসে পড়ল তার পিঠে। 'আজ থেকে তোমার বেতন বাড়িয়ে দেব। এতদিন ধরে কাজ করছ আমার এখানে, তোমার পরিবারের দিকে নজর দেয়াটা আমার কর্তব্য। আজ বিকেলে ধূমায়িত বিশপ পান করব আমরা দু'জনে। পান করতে করতে শুনব তোমার সমস্যা। আগুনটা উসকে দাও, তারপর আরেকটা কয়লার বাক্স কিনে নিয়ে এসো তোমার জন্যে। এক্ষুণি!'

স্ক্রুজের একটা কথাও 'কথার কথা' ছিল না। বব ক্র্যাচিটের পরিবারের সমস্যা মিটিয়ে দিলেন তিনি। প্রত্যেকটা দুঃখী মানুষ আর কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে দান করলেন উদার হাতে। দেখতে দেখতে পুরো শহরের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠলেন তিনি। তবে, বাঁকা হাসি হাসতেও ছাড়ল না কেউ কেউ। কিন্তু সে-হাসিকে তিনি থোড়াই কেয়ার করেন। একজাতের লোক যুগে যুগে পৃথিবীর যাবতীয় ভাল কাজকে বিদ্রূপ করে এসেছে–কথাটা জানা আছে তাঁর। তাছাড়া, তাঁর হৃদয়ে বয়ে চলেছে যে-হাসির ঝরনা, সে-ই যথেষ্ট: দুষ্ট লোকের দূষিত হাসিকে আমল না দিলেও চলে।

কোন ভূতের সাথে আর কখনও দেখা হয়নি তাঁর। দরকারও নেই। তাদের শিক্ষা নির্ভুলভাবে মেনে চলেন তিনি। সবাই বলে, ক্রিসমাস কীভাবে পালন করতে হয়, তা জানেন বটে এব্‌নেজার স্ক্রুজ। আহ্, আমাদের সবার সম্বন্ধেই যদি কথাটা বলা যেত!

কিশোর ক্লাসিক
তিনটি বই একত্রে

আ জেন্টলম্যান অভ ফ্রান্স: স্ট্যানলি ওয়েইম্যান/কাজী আনোয়ার হোসেন

বেকার এক যোদ্ধা আমি খুবই অভাব-অনটনে কাটছে দিন। হঠাৎ রাজা এসে হাজির। আমাকে কাজ দিলেন একটা। জনা কয়েক লোক নিয়ে দুর্ভেদ্য এক দুর্গ থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে একটা মেয়েকে। ভুল লোক বাছাই করে বিপদে পড়ে গেলাম আমি। তারপর বুঝলাম, এদের চেয়েও বড় বিপদ অপূর্ব সুন্দরী ওই মেয়েটা। উহ্! মেজাজ কী! আর কী ব্যবহার! আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটছে একের পর এক।

নিশিকন্যা: রেনে জুইঅ/রকিব হাসান

কেপু– এক নিশিকন্যা, অন্ধকারের সম্রাট আবগার সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, ভাগ্যের ফেরে দেশ ছাড়তে হলো তাকে।
যুদ্ধ শিখল ভয়ঙ্কর এক পুরুষ চিতার কাছে। মরুর দুর্ধর্ষ বেদুইন সর্দারের ছেলে আমান্তানের হাতে ধরা পড়ার পর বুঝল ভালবাসা কাকে বলে। বন্ধুকে বাঁচাতে নিজের জীবন বিপন্ন করে রুখে দাঁড়াল ভয়ানক এক সিংহের বিরুদ্ধে। এ-কাহিনি ভালবাসার কাহিনি।

আ ক্রিসমাস ক্যারল: চার্লস ডিকেন্স/খসরু চৌধুরী

হাড়কিপটে এক বুড়ো– এব্‌নেজার স্ক্রুজ। ভিক্ষুকও তাঁর কাছে হাত পাতে না, ছায়া দেখলে চমকে ওঠে কুকুর। অথচ এক ক্রিসমাসে হঠাৎ করে সবার প্রতি সদয় হয়ে উঠলেন তিনি। সবাই অবাক। আমরা জানি, পর পর তিন রাতে তিনটে ভূত কথা বলেছে তাঁর সাথে। সেজন্যেই কি এই বিস্ময়কর পরিবর্তন?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০